জীবন খাতার কয়েকটি পাতা

লেখিকা: কেয়া দত্ত

BlueRose ONE.com
Stories Matter
NewDelhi • London

BLUEROSE PUBLISHERS
India | U.K.

Copyright © Keya Dutta 2026

All rights reserved by author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author. Although every precaution has been taken to verify the accuracy of the information contained herein, the publisher assumes no responsibility for any errors or omissions. No liability is assumed for damages that may result from the use of information contained within.

BlueRose Publishers takes no responsibility for any damages, losses, or liabilities that may arise from the use or misuse of the information, products, or services provided in this publication.

BlueRoseONE.com
Stories Matter
NewDelhi • London

For permissions requests or inquiries regarding this publication, please contact:

BLUEROSE PUBLISHERS
www.BlueRoseONE.com
info@bluerosepublishers.com
+91 8882 898 898
+4407342408967

ISBN: 978-93-7542-158-0

Cover design: Keya Dutta
Typesetting: Namrata Saini

First Edition: March 2026

“For my beloved husband, Salil and my loving family.”

সূচক

আমাদের দুর্গাবাড়ী 1

বাড়ীর পুজোর আনন্দ 3

এক বৃষ্টি ভেজা রাত 8

ফেলে আসা দিনগুলি 14

নীল নদের ধারে.. 21

মধুপুরের স্মৃতি 25

সেকালের শিষ্টাচার.. 30

একটি আরাম কেদারা 33

হলুদ পাখী 36

বাবুদের খামখেয়ালীপনা.. 38

ফেরিওয়ালা 42

এসো বসো আহারে.. 46

ফিরে চলো মাটির টানে.. 49

আমাদের দুর্গাবাড়ী

কেয়া দত্ত

আমাদের কাছে দুর্গাবাড়ীর পুজো মানে বাড়ীর পুজো। সারা বছর আমরা বসে থাকি এই দিনগুলোর জন্য। আমার দুর্গাবাড়ীর সঙ্গে পরিচয় সত্তর দশকের মাঝামাঝি। প্রথম আমি যখন বম্বে আসি। তখন পুজার সময় ভীষণ মন খারাপ লাগত, কারণ কলকাতায় আমার বাড়ীর পুজা ছেড়ে আসতে হয়েছিল।

কলকাতাতে আমাদের বাড়ীর (হাটখোলা দত্ত বাড়ীর) পুজো প্রায় আড়াইশো বছরের। সেই পুজোর আনন্দটা কিছুতেই ভুলতে পারতাম না। ঠাকুর দালানে শ্বশুর, ভাশুর, জা সকলে মিলে বসে আড্ডা গল্প এইগুলো যেন মনে হতো স্বপ্নের মতো।

বম্বে এসে প্রথমে চেম্বুর, পরে কোলাবায় থাকতাম। সেখানে পুজোমন্ডপেও যেতাম, কিন্তু মন বসত না। সেই কলকাতার স্মৃতি নিয়েই বসে থাকতাম। এরপর কোলাবা ছেড়ে এলাম নেপেন সী রোড ও এলটামাউন্ড রোডে। সেখানে এসে আমি বম্বে দুর্গাবাড়ীকে পেলাম। যবে থেকে আমি দুর্গাবাড়ীর সঙ্গে যুক্ত হলাম, মনে হল আমার বাড়ীর পুজো আমি ফিরে পেলাম।

৭০ দশক মানে কতো বছর আগে, সেই সময় আমাদের পুজোর মিটিং সব মেম্বারদের বাড়ী বাড়ী হতো। সেই মিটিংএও প্রচুর খাওয়া দাওয়া আড্ডা সব হতো। এই মিটিংগুলো নেবার জন্য সব মেম্বাররা খুব উৎসাহিত থাকতেন। তবে তখন মেম্বারদের সংখ্যা এতো ছিল না। তাই বাড়ী বাড়ী করা সম্ভব হতো। কিন্তু তখনকার আনন্দটা একটু অন্যরকম ছিলো।

দুর্গাপুজোতে আমরা সকলে মিলে সব কিছু নিজেরা তদারক করি। ঠাকুরের কাঠামো বাঁধা থেকে মাটি পড়া, মায়ের চোখ আঁকা, সাজ সব আমরা নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে করি বা করাই। এমন কি দরকার মত আমরা গনেশ, কার্তিক বা অসুরকে রঙও করেছি। তারপর মৃৎশিল্পীদের সাহায্য করার জন্য আমরা মায়ের কাপড়ে পাড় বসানো,

চুমকি বসানো সব ওখানে বসে সবাই মিলে করি। এটার ভিতর একটা ভীষণ আনন্দ আছে।

কলকাতায় ঠাকুরবাড়ী দালানে যখন ঠাকুর তৈরি হত, আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম। সেখানে বাড়ীর বৌ, তাই দালানে যেতে পারতাম না।

আমাদের পুজোর আর একটা মজার কথা মনে আছে। শরদ পাওয়ার যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন আমাদের পুজোতে এসেছিলেন। কখন পুজোতে আসবেন ঠিক নেই, সকাল থেকে পুজোর হলে পুলিশ ভর্ত্তি। সব জায়গায় পুলিশ ঘুরছে। তারপর এল কুকুর। বাপ রে বাপ, সে এক কেঁদো কুকুর। ঠাকুরের সব জায়গায় শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে। আর এই নিয়ে সবাই বিব্রত।

এবার বলি আমাদের নাটকের কথা। প্রতি বছর আমাদের মেম্বাররা নাটক করেন। এই নাটকের ভেতরেও খুব মজার মজার ঘটনা ঘটে। এরপর কী নাটক হবে, কে কে করবে, কে করাবে, রিহার্সালে কী খাওয়া হবে, এক একজনের এক এক রকম চাহিদা। নাটক নিয়ে মজার মজার কথা লিখতে বসলে লেখা আর শেষ হবে না।

আরও একটা জিনিস আমরা খুব আনন্দ করে করি। সেটা হল মায়ের ভোগ বিতরণ। তিন ঘন্টা, চার ঘন্টা যাই হোক, আমরা সকলে মিলে আনন্দ করতে করতে এই কাজটা করি। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত হয়ে গেলেও সকলের মুখে হাসি থাকে।

গত বছর আর এই বছর করোনার প্রভাবে আমরা এইসব আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। ঠাকুর করুন সামনের বছর থেকে আমরা যেন সকলে মিলে আবার আগের মতন আনন্দ করতে পারি।

বাড়ীর পুজোর আনন্দ

কেয়া দত্ত

সকালবেলায় ঘুম ভাঙতেই জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। ঝলমল করছে রোদ, মনটা খুব ভালো লাগলো। এটা শরৎকাল। কলকাতাতে এই সময়ে আকাশের দিকে তাকালে তুলোর মত ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ভেসে চলেছে দেখা যায়। বম্বেতে শরৎকাল বলে তো কিছু বোঝা যায় না।

আরে! পুজো তো এসেই গেল!

কয়েকদিনের ভেতরই মা দুর্গা আসছেন। আকাশে বাতাসে তারই প্রকাশ। আমার মনটা আবার চলে গেল সুদূর কলকাতায়। ঠাকুমা, দিদিমার পর্যায়ে পৌঁছে পুরানো দিনের স্মৃতিচারণ করতে খুব ভালো লাগে।

আমার বাপের বাড়ী কলকাতার এক রক্ষণশীল প্রাচীন বাড়ী – নামেই সকলে চেনে। খুব অল্প বয়সে আমার বিয়ে হয় বিখ্যাত হাটখোলার দত্ত বাড়ীতে। আমি সেই বাড়ীরই ছোট বৌ। এই দত্তবাড়ী আমার বাপের বাড়ী থেকেও অনেক প্রাচীন। শোনা কথা, এক সময় গোবিন্দপুর গ্রামটা ছিল এ বংশের পূর্বপুরুষ গোবিন্দশরণ দত্তের। পরে গোবিন্দপুর কলকাতার সঙ্গে মিশে যায়।

আমার খুব ভালো লেগেছিল যখন শুনলাম এদের বাড়ী দুর্গাপূজা হয়। কারণ আমার বাড়ীর পূজা খুব ভালো লাগতো। দত্তবাড়ীর পুজো ২৫০ বছর ধরে হয়ে আসছে।

আমার শ্বশুরবাড়ী উত্তর কলকাতার নিমতলার ঘাট স্ট্রীট এর উপর। জোড়াবাগান থানার বাড়ীটা ছাড়ালেই দত্ত পাড়া আরম্ভ হয়ে গেলো অন্ততঃ একশোটা বাড়ী গায়ে গায়ে লাগান। ওখানে সকলেরই পদবী দত্ত। ঠাকুরবাড়ীটা এরই মাঝখানে।

এই বয়সেও যখন নিমতলা ঘাট স্ট্রীট দিয়ে যাই তখন নিজের অজান্তেই মাথায় ঘোমটা উঠে আসে যদিও দেখে ঘোমটা টানার মতন লোক এখন অনেক কমে গেছে।

যা বলেছিলাম। ঠাকুরবাড়ীর সামনে একটা উঠোন। বালি, চুন, সুরকির তৈরী ঠাকুর দালান। সেখানে কাঠের তৈরী ঠাকুরের সিংহাসন। প্রত্যেক পুজোর আগে রাংতা মুড়ে সিংহাসনকে সাজানো হয়। ঠাকুরদালানের মেঝেটা মাটির। পুজোর আগে ইঁদুরের গর্তগুলো বন্ধ করার জন্য মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। খাস কলকাতা শহরের মধ্যে এরকম গ্রাম্য পরিবেশ না দেখলে বিশ্বাস হবে না। ঠাকুরদালানের বাঁদিকে একটা সুরঙ্গ মতো ঘর লোহার গরাদ দেওয়া। মনে আছে আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করাতে উনি বুঝিয়েছিলেন ওটা গুম ঘর। যাদের শাস্তি দেওয়া হয় তাদের ওখানে আটকে রাখা হয়। এখন ভাবলে খুব হাসি পায়, তখম কিন্তু খুব ভয় পেয়েছিলাম। বয়সও অনেক কম ছিল তো! পরে শাশুড়ীমার কাছে শুনেছিলাম, ঐ ঘরটা হলো খাজনা ঘর। এক সময়ে ঐ পরিবারের জমিদারি ছিল অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। আগে যখন খাজনা আসতো, তখন ঐ ঘরটাতে রাখা হতো। এখন তো ঐ ঘরটাতে অসংখ্য ইঁদুর বাসা বেঁধেছে।

রথযাত্রার পর থেকেই পুজোর উদ্যোগ আরম্ভ হয়। যে বাঁশগুলো দিয়ে ঠাকুরের কাঠামো তৈরী হয় তাকেও পুজো করা হয়। একচালার ঠাকুর। ডাকের সাজ। বছরের পর বছর একই রকম। একই সাজ, একই রং, এমন কী ঠাকুরের যে শাড়ি মাটির উপর আঁকা হয় তার ডিজাইনও এক। এখনো ঠাকুর গড়তে কৃষ্ণনগর থেকে কুমোরেরা আসেন। তাঁরাও একই পরিবারের। বংশ পরম্পরা ধরে ঠাকুর তৈরী করে যাচ্ছেন।

আমি যাঁকে কাজ করতে দেখেছি, তাকে আমার স্বামী শিবুদা বলে ডাকতেন। ওনার পুরো নাম জানি না। শিবুদাকে বলতে শুনেছি যে দত্তবাড়ী থেকে তিনি যা পারিশ্রমিক পান তাতে তার আসা-যাওয়া, খাওয়ার খরচ কোনরকমে চলে যেতো, কিন্তু ওঁর পারিশ্রমিক বলে কিছু বাঁচত না। তাও প্রতিবার তিনি আসতেন, - না এসে থাকতে পারতেন না। ঠাকুরের এমনই টান। ওঁর কাছে ড্রইং বলে কিছু থাকে না, মন থেকে বছরের পর বছর ঠিক একই রকম ডিজাইন ও একচালার ঠাকুর তৈরী করেন। আমার খুব অবাক লাগতো এটা কেমন করে হয়!

পুজোর কিছুদিন আগে থেকেই ঠাকুরদালান, বাড়ী চুনকাম করা হয়। পুরো বাড়ী তখন এক নতুন সাজে সাজে।

পুজোর আনন্দ আরম্ভ হয় মহালয়ের দিন থেকেই। ঐদিন ভোর চারটের সময় উঠে হাতে গরম চায়ের কাপ নিয়ে রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদার কন্ঠে মন্ত্রপাঠ শোনা হতো। সে এক অদ্ভূত অনুভূতি। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সঙ্গে দত্তবাড়ীর এক আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। সেইজন্যেই বোধহয় আশেপাশে সব দত্তবাড়ীতেই খুব জোর রেডিও চালান হতো।

আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তা চলে গেছে সোজা গঙ্গার ঘাটের দিকে। সপ্তমীর দিন ঢাকের আওয়াজে সকলের ঘুম ভাঙ্গে। ঐদিন খুব ভোর থেকে সকলে কলাবৌ চান করাতে নিয়ে যায় গঙ্গাতে। ঐ কটা দিন সকাল থেকে রাত্রি অবধি সারাদিন কাঁসর ঘন্টা ঢাকের আওয়াজ শোনা – সে এক অপূর্ব পরিবেশ। এ জিনিস ভোলা যায় না।

ঠাকুর দালানের কাছেই মায়ের ভোগ তৈরী হয়। ময়দা, ঘি, চিনি দিয়ে গজা, মিঠেগজা, নিখুঁতি, পেরাকী, দরবেশ আরো কত কী! সপ্তমীর সকাল থেকেই ঘিয়ের গন্ধে বাড়ী ম` ম` করে।

ঠাকুরবাড়ীতে একটা ঘন্টা লাগানো আছে। সেই ঘন্টা বাজিয়ে সকলকে জানানো হয় আরতির সময় হয়েছে। সকলে ঠাকুর দালানে জমায়েত হও।

দিনে চারবার ঘন্টা বাজে। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় ও রাত্রি। সকালের আরতিকে বলা হতো প্রাতঃআরতি, মধ্যাহ্নের ভোগারতি, সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যারতি ও রাত্রে শয়নারতি।

আরতিতে যাওয়ার আগে মেয়েদের মধ্যে সাজগোজের ঘটা লেগে যায়, বিশেষ করে আইবুড়ো মেয়ে এবং নতুন বৌদের ভেতরে। রীতিমত প্রতিযোগিতা লাগে, কারণ ওখানে সবাই দেখবে তো, আইবুড়ো মেয়েদের সম্বন্ধ আসবে আর নতুন বৌদের কে কেমন দেখতে সেই নিয়ে আলোচনা চলবে। আমার স্বামীকে দত্তবাড়ীতে বাসুদেব বলেই সবাই চেনে। আমার বিয়ের প্রথম বছর ঠাকুরদালানে সবাইকে বলতে শুনেছি বাসুদেব তোর বৌকে তো বেশ দেখতে। ঘোমটার আড়ালে হেসেছিলাম, ভাবলাম যাক বাঁচলাম, পার পেয়ে গেছি।

পূজার সময় বাড়ীর বাবুরা ও ছেলেরা কেউই সাজগোজে পিছিয়ে থাকে না, তাঁরাও কোঁচন ধূতি, গিলে –করা পাঞ্জাবী, নানারকম গায়ে চাদর এই সব পরেন। অষ্টমীর দিন সকলে গরদের জোড় পরে অঞ্জলি

দেয়। এই দিনটাতে সব থেকে বেশি লোক হতো। সন্ধিপূজার সময় ঠাকুর দালানে লোকে ভরে যেতো।

পূজার কটা দিন ঠাকুরদালানে শতরঞ্চি বিছিয়ে বসে শ্বশুর, ভাসুরদের সঙ্গে আড্ডা চলতো, আর সেই সব রাসভারী শ্বশুররাও তখন বন্ধুর মতন হয়ে যেতেন। তখনই ওঁদের কাছে পুরানো দিনের অনেক গল্প শুনেছি। আগে নাকি পুরো বাড়ী আতর দিয়ে পোঁছা হতো। বাবুরা ঘোড়ার গাড়ীতে হাওয়া খেতে যেতেন। সেই ঘোড়ার লেজে আতর লাগানো হতো। হল ঘরে বড় বড় সব ঝাড় লন্ঠন জ্বেলে বাইজী নাচ হতো। নিজেরাই বাড়ীতে থিয়েটার করতো, তাতে ছেলেরাই মেয়ে সাজতো। যাত্রা হতো। আর বৌরা সব চিকের আড়ালে বসে ঐসব দেখতো। যাই হোক, দেখতে দেখতে নবমী এসে যেতো আর তখন থেকেই মনটা খারাপ হতে শুরু করতো। পুজো তো শেষ হতে চলছে।

নবমীর রাত্রে বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন আসতেন। সকলের নিমন্ত্রণ থাকতো। অষ্টমীর নিরামিষ খাওয়ার পর ঐদিন ভালো মন্দ খাওয়া হতো।

দশমীর দিন সকালে হতো দর্পণ বিসর্জন। তারপরই ঢাকীদের ঢাকের আওয়াজ পালটে যায়। তখন ধুন ওঠে, “ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ ঠাকুর যাবে বিসর্জন”। তখন সকলেরই চোখ জলে ভরে যায়। কেউ না কেঁদে থাকতে পারে না। বিসর্জনের পরই দধিকর্মা। আমাদের বাড়ীতে সেদিন আবার অরন্ধন হয়। মনে আছে ইলিশমাছ এবং চালতার অম্বল মেনুতে থাকবেই আর থাকবে অনেক রকম ভাজা।

দুপুর হলেই প্রতিমাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে উঠোনে নিয়ে আসা হয়। দুপুরে খাওয়ার পরই মাকে বরণ করার সময় হয়ে আসে। বাড়ীর বৌরা আর বিবাহিতা মেয়েরা মাকে বরণ করে, ট্র্যাডিশন মেনে সকলেই বেনারসী শাড়ী এবং গাভর্তি গয়না পরে বরণ করে। বরণের পর বিকেলের দিক বাড়ীর ছেলেরা ও বাবুরা ধূতি, পাঞ্জাবী পরে ঠাকুর বিসর্জন দিতে যায়। তারা ভাসানে যাওয়ার সময়ে সঙ্গে খাঁচায় পোরা একটি নীলকন্ঠ পাখিকে নিয়ে যায়। ছোট ছোট ছেলেরা নীলকন্ঠ পাখিকে কয়দিন আরশোলা খাইয়ে গায়ে শক্তি এনে দেয়। কারণ পাখিটাকে অনেক পথ উড়ে যেতে হবে তো কৈলাশে, সেখানে শিবকে গিয়ে খবর দেবে – মা আসছেন। যদিও এখনকার দিনে নীলকন্ঠপাখি রাখা বেআইনি, কিন্তু পুলিশেরাও জানে যে দত্তবাড়ীর পুজোতে এই পাখি নিয়ম রাখতে তারা ওড়াবেই। তাই তারা দেখেও দেখে না। বিসর্জন দিয়ে বাড়ীর বাবুরা যখন ফেরে প্রত্যেকবার একই গান গাইতে শুনেছি “কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য”।

সন্ধ্যা হতেই রাস্তাতে প্রচুর লোক সব বিসর্জন দেখতে আসে। তারই ভেতর ফুচকা, আলুকাবলি, ঘুগনি এই সব বিক্রি করতে লোক বসে যায়। অল্পবয়সীরা বরদের কাছ থেকে পার্বণী পেতো। একটাকা, দুটাকা করে সকলের হাতে পনের কুড়ি টাকা এসে যেতো। সেই টাকা থেকে ঐসব কিনে খাওয়া হতো। কী ভালই না লাগতো ঐসব খেতে। তারপর বাড়ীর ছেলেরা সবাই মিলে একটা বাছুরের লেজ ধরে ঘুরতো। এটাকে বলে বৈতরনী পার করা। এটাও নাকি একটা নিয়ম (বৈতরনী কোথায় তা জানি না)। আমার মনে আছে একবার বাছুর ঘুরছে না তখন তার লেজ কালীপটকা লাগানো হলো আর যেই না সেটা ফেটেছে, অমনি সে কী দৌড় ! এরপর সবাই গিয়ে ঠাকুরদালানে বসে। ঠাকুরমশাই শান্তি জল এনে দেন। তারপর চলে কোলাকুলির ও নমস্কারের পালা। এক মাথা ঘোমটা দিয়ে সকলকে প্রণাম করা। কোমর ব্যথা হয়ে যেতো প্রণাম করতে করতে।

তারপর যে যার বাড়ীতে চলে গিয়ে সিদ্ধির সরবত খাওয়া হতো। বাদাম, দুধ, সিদ্ধি এই সব মিলিয়ে সরবত হতো। এটা তৈরী করতো বাড়ীর কাজের লোকেরা। তাদের কাজের লোক না বলাই ভাল, কারণ তারা বাড়ীর লোকেরই মতন। সিদ্ধি খাওয়ার পর যা অবস্থা হতো সকলের সে এক দেখার মতন। বড়জায়েরা, ভাসুরেরা সকলে মিলে খাওয়া হতো। ছোটরাও বাদ পড়তো না। একবার আমার স্বামী ও বড়জা দুজনে মিলে এমন হাসি আরম্ভ করলো যে সে আর থামানো যায় না। আমি বিয়ের পর পাঁচ, ছয় বছর কলকাতাতে ছিলাম। এই পাঁচ ছয় বছরের পুজোর আনন্দের কথা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভুলবো না। আমার দুঃখ ছেলেমেয়েদের ঐ আনন্দের স্বাদ দিতে পারলাম না।

এক বৃষ্টি ভেজা রাত

কেয়া দত্ত

আজ সকাল থেকেই সারাদিন বৃষ্টি হয় চলেছে। আকাশ কালো মেঘে ঢেকে আছে। বৃষ্টি পড়ে মাটি থেকে সোঁদা গন্ধ বেরোচ্ছে, ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়ার জন্য বেশ গা শিরশির করছে। বর্ষাকালের এই রকম পরিবেশ আমার কিন্তু বেশ ভালই লাগে। এই সময়ে যদি একটা গল্পের বই হাতে থাকে তাহলে তো আর কথাই নেই। সেটা যদি ভূতের গল্প হয়। আমার গল্পের বই পড়া অভ্যাস আছে। পড়িও, কিন্তু নিজে কোনদিন গল্প লিখিনি। তাই ভাবলাম একটা গল্প লেখার চেষ্টা করি। এই কথা মনে হতেই এক কাপ কফি, খাতা আর কলম নিয়ে বসে গেলাম আমার জীবনে এক বৃষ্টি ভেজা রাতের কথা লিখতে। যেটা জীবনে কোনদিন ভুলব না।

কয়েক বছর এইরকম বৃষ্টির সময় আমরা বন্ধুরা মিলে ঠিক করেছিলাম বম্বের কাছে কোথাও একটু ঘুরতে যাব। বম্বের কাছাকাছি অনেক ঘোরার জায়গা আছে যেমন – মহাবালেশ্বর, খান্ডালা, নোনাভোলা এই রকম ছোট ছোট অনেক জায়গা। বর্ষার সময় এই ছোট ছোট পাহাড়ী জায়গাগুলো এতো সুন্দর লাগে যে এই সব জায়গাগুলোতে সকলেই ঘুরতে যায়। আমরাও এর ভিতর থেকে কোথাও একটা যাবার কথা ভাবছিলাম। বন্ধুদের ভিতর শেখর, মন্দিরা, অরূপ, রত্না সকলেই খান্ডালাটাই বেছে নিয়েছিলো যাবার জন্য, সলিলও ওদের কথাতে রাজী হয়ে গেলো খান্ডালাতে যাবার জন্য। দুই, একদিনের জন্য যাওয়া ঠিক হয়েছিলো। যাওয়ার ঠিক হতেই গোছগাছ শুরু করেছিলাম। দুই দিনের জন্য যাওয়া কিন্তু লটবহর তো কম নয়। গানের CD জল, শুকনো খাবার, চা, কফি এমন কি চায়ের কেটলিটা পর্য্যন্ত। ওখানে সবই পাবো জানতাম, কিন্তু যদি না পাওয়া সেই ভেবেই এতে সব সঙ্গে নেওয়া।

যেদিন রওনা হবো সেদিন সকালে উঠে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম খান্ডালার উদ্দেশ্যে।

খান্ডালা যাবার পথে McDonald পড়ে। আমরা ওখানে মিলিত হয়েছিলাম। তারপর ওখান থেকে এক সঙ্গে রওনা হয়েছিলাম খান্ডালার উদ্দেশ্যে। বর্ষার সময় তাই মাঠ, ঘাট সব সবুজ হয়েছিলো।

দূরে পাহাড়ের গা বেয়ে ঝর্ণা বয়ে চলেছে আর তার মৃদু আওয়াজ আমরা দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম।

আকাশ কালো মেঘে ঢাকা তারই ভেতর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ এর ঝিলিক দেখা যাচ্ছিল। দূরে পাহাড়ের গা দিয়ে কিছু কিছু মেঘ ভেসে চলেছে। আবার কিছু সাদা মেঘ পাহাড়ের গায়ে আটকে আছে, দেখে মনে হচ্ছিল তুলোর গোলা আটকে আছে। ভগবানের দেওয়া এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমরা সকলেই খুব উপভোগ করেছিলাম। বাইরে বেশ ঠান্ডা হাওয়া বইছিলো, বুঝতে পারছিলাম এবার বৃষ্টি নামবে। ঠিক তাই হলো কিছুক্ষণের মধ্যে জোর বৃষ্টি শুরু হলো। এতো বৃষ্টি যে গাড়ী চালান অসুবিধা হচ্ছিলো। পাহাড়ী রাস্তায় এই রকম বৃষ্টিতে গাড়ী নিয়ে যাওয়াটা খুবই বিপদজনক।

এদিকে এতো বৃষ্টি দেখে আমার মেয়ে তিতলী ও ছেলে সম্রাট সমানে ফোন করছে। মন্দিরার মেয়ে সোনালী, অরূপের মেয়ে টিমটিম সকলেরই ফোন আসছে আমরা ঠিকমত পৌঁছেছি কি না জানার জন্য। টিমটিম আবার পুনেতেই থাকে ওর কাছে শুনেছিলাম ওখানেও খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা কিন্তু সকলেই খুব খুশীছিলাম বৃষ্টি পেয়ে। কারণ এই বর্ষাতে বৃষ্টির জন্যই তো যাওয়া। যাইহোক বৃষ্টি মাথায় নিয়ে যখন খান্ডালা পৌঁছেছিলাম তখন প্রায় দুপুর তিনটে বাজে।

খান্ডালা শহরটা খুবই ছোট। এই শহরটা চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা, এরই ভিতর ঝর্ণা, গাছপালা, হোটেল, ছোটছোট বাংলো, স্কুল, বাজার সবই আছে। আর আছে প্রচুর চীকির দোকান। ওখানকার চীকি খুব বিখ্যাত। আমরা যখনই যাই ওখান থেকে চীকি কিনে আনি।

খান্ডালাতে আমরা সরকারি একটা বাংলো বুক করেছিলাম। বাংলোতে ঢোকার মুখেই গাছপালা দিয়ে ঢাকা একটা লোহা গেট। গেটের রাস্তাটাই চলে গেছে সোজা বাংলোর দিকে। আবার ঐ রাস্তাটাই ঘুরে চলে গেছে বাংলোর পিছনের দিকে। বাংলোর পিছনেই খুব পুরানো একটি চার্চ আছে। দেখেই আমরা বুঝেছিলাম। এই বাংলো এবং চার্চ বহু পুরানো। এইগুলো বৃটিশ আমলে তৈরী।

বাংলোর সামনে দুই, তিনটে সিড়ি দিয়ে ওঠেই কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটি বারান্দা। বারান্দার মাধখানে বিরাট বসার ঘর। বসার ঘরের দুই পাশে বিরাট বড় চারটে শোবার ঘর। শোবার ঘরের সঙ্গে ড্রসিংরুম ও তার গায়ে বাথরুম। এতো বড়ো ঘর যে আসবার পত্র রাখা সত্ত্বেও ফাঁকা

মাঠ মনে হচ্ছিল। আগেকার বাড়ী তাই খুব উঁচু সিলিং কড়ি, বরগা দেওয়া।

বাংলোটার বাইরে খুব গাছপালা থাকাতে একটু জঙ্গল জঙ্গল ভাব। দূরে একটা ছোট ঝর্ণা। এর পিছনে একটা বিশাল কালো পাহাড় দেখে মনে হচ্ছিলো যেন একটা দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতেই পেরেছিলাম রাতের অন্ধকার এখানে কেমন লাগবে। সত্যি বলতে কী একটু গা ছমছমই করছিলো। তার উপর এখানে বেশ লোডশেডিং হয়। এক ঘন্টা লাইট এলো তো আবার চলে গেলো। বিকেল পাঁচটা নাগাদ বৃষ্টিটা একটু কমতে, সলিল, শেখর ও অরূপ এরা তিন বন্ধু ছাতা মাথায় দিয়ে একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলো। রত্না, মন্দিরা আর আমি আমরা কাঁচের বারান্দাতে বসে চা খাচ্ছিলাম। এমন সময় ওখানের চৌকিদার এসে রাত্রের কি খাবরের মেনু করবে তা আমাদের কাছে জানতে চাইলো। সব শুনে সে চলে যেতে যেতে একটু দাঁড়াল, আর বললো নটার ভেতর খাবার হয়ে যাবে। আমি আপনাদের তাড়াতাড়ি খাবার দিয়ে দেবো। আর খাবার খেয়ে আপনারা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বেন, রাত্রে আর বাইরে কোথাও বেরোবেন না।

চৌকিদারকে আমরা খাবারটা একটু তাড়াতাড়ি দিতে বলেছিলাম কারণ সকলেই ভীষণ ক্লান্ত ছিলাম।

কিন্তু লোকটা এরকম বলল কেনো? আমার শুনে একটা খটকা লাগলো। কিছু তো কারণ আছে না হলে ও বলবে কেনো? যাই হোক এরা তিন বন্ধু ঘুরে যখন বাংলোতে এসে পৌঁছালো তখন বাইরেতে অন্ধকার নেবেছে। আমরা চৌকিদারের কথাটা এদের জানালাম এরা তিনজনে হেসেই অস্থির। সাতটা নাগাদ আমরা সকলে মিলে কাঁচঘেরা বারান্দাতে আড্ডা দিতে বসেছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার লোডশেডিং। অন্ধকারে মোমবাতি জ্বালিয়েও কেউ কারো মুখ দেখতে পারছিলাম না। এতো অন্ধকার যে বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। ঠিক তখন আটটা বাজে তখন আবার জোর বৃষ্টি শুরু হয়েছিলো আর তার সঙ্গে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকানো। আমরা ভাবছিলাম তাড়াতাড়ি খেয়েই শুয়ে পড়া যাবে। খাবার না দেওয়া অবধি আমরা গল্পই করছিলাম। অন্ধকার এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছিলো যে কেউই খুব একটা কথা বলছিলাম না। সকলেই একটু অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। মোমবাতির আলোতে নিজের ছায়া দেখেও তখন ভয় লাগছিল। সাড়ে নটা নাগাদ আমাদের রাত্রে খাবার ওরা দিয়েছিলো। সেদিন রাত্রে আমরা Candle light ডিনার করেছিলাম, আমাদের খাবার সময় লক্ষ করছিলাম চৌকিদার বার বার জানালার

বাইরে কিছু দেখার চেষ্টা করছে। বাইরেতে অন্ধকার কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। তবে ও কী দেখার চেষ্টা করছিলো?

আমাদের ডিনার হয়ে যাবার পর লোকটি সব জানালা, দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতর বড়ো বড়ো মোমবাতি লাগিয়ে চলে গিয়েছিলো। মোমবাতির আলোতে পুরো জায়গাটা একটু অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এরই ভিতর রত্না আমাকে বলেছিল কেয়াদি একটা ভূতের গল্প হয়ে যাক। মন্দিরা তো সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে বলে একদম না। একেই এখানে একটু কীরকম লাগছে এর উপর ভূতের গল্প শোনার ইচ্ছা নেই। যাই হোক বাইরে কিন্তু বৃষ্টি বেড়েই চলেছে। জানালার কাঁচ সব ঝপসা হয়েছিলো। হঠাৎ একটা জোর শব্দ আমরা শুনলাম আর আশ্চর্য্য যে ঘরের যত মোমবাতি জ্বলছিলো সেগুলো সব একসঙ্গে নিভে গিয়েছিলো। আমরা সকলেই প্রচন্ড ভয় পেয়েছিলাম। দেশলাই খুঁজে কোন রকমে একটা কী দুটো মোমবাতি জ্বালান গিয়েছিলো, আওয়াজটা কিসের কিন্তু কিছুই বুঝলাম না। আর তার সঙ্গে ঘরের বাতিগুলোরই বা কী সম্পর্ক তাও বুঝলাম না। আমরা এ ওর মুখ দেখছি কী করবো। কেউ নেইও যে তাকে জিজ্ঞাসা করবো। সকলে ঠিক করা হলো শুয়ে পড়া যাক কিন্তু এতো অন্ধকার ঘরে হাঁটাও মুশকিল। টর্চ একটাই ছিল সেই টর্চ তিনজনের ঘরে কি করে হবে? আমরা ভেবেছিলাম একজন একজন করে যে যার ঘরে চলে যাবো। কিন্তু যাওয়া হয়নি তার আগেই দেখি বারান্দার কাঁচে কারোর একটা ছায়া সরে যাচ্ছে। সেই দেখে তো আমাদের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। আমরা নিজেদেরই বোঝাচ্ছি না ওটা কিছু নয় কোন গাছের ছায়া। কিন্তু বাইরে কোন আলো নেই ভেতরেও কোন আলো নেই তা হলে ছায়া পড়বে কি করে?

চারদিক থমথমে, নিশুতি রাত নিজেদের ভেতর কথা নেই বাইরে ঘন অন্ধকার আর বৃষ্টির আওয়াজ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তারই আলোতে একটু করে বাইরেটা দেখতে পারছিলাম।

এমন সময় বাইরে কাঁচের দরজাতে জোর জোর ধাক্কা অথচ বাইরে কেউ নেই। এইরকম পরিস্থিতিতে আমরা ঠিক করেছিলাম সকলে আলাদা না থেকে একসঙ্গে রাতটা কাটাবো। তাই ঘুমের কথা ভুলে আমরা এক সঙ্গে বসেই রইলাম। কিন্তু চুপচাপ কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়, সকলেরই চোখে বেশ ঘুম।

হঠাৎ দেখি বাইরে একটা আলো এসে পড়েছে। আমরা দেখলাম ঝর্ণাটা যেদিকে ছিলো সেই দিক থেকে একটা লন্ঠনের আলো আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু সকলেই যখন দেখছি তার মানে সত্য লাইট জ্বলছে। ধীরে ধীরে আলোটা কাছে আসতে লাগলো। আসতে আসতে আরো কাছে তারপর আরো কাছে এরকম করে যখন

একেবারে বাংলোর কাছে এসেছে, বিদ্যুৎ এর আলোতে দেখেছিলাম সাদা জামা, গলাতে চাদর, হাতে লন্ঠন নিয়ে একজন পাদ্রী দাঁড়িয়ে আছে। তারপরেই সে ধীরে ধীরে চার্চের দিকে এগোতে লাগলো। সকলের মুখেই একই কথা আমরা ঠিক দেখছি তো? নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ভয়ে ঠাকুরের নাম জপ করছিলাম। একটু বাদেই আমরা কিন্তু লন্ঠন ও পাদ্রী কাউকেই দেখতে পাইনি। ভয়েতে খালি মনে হচ্ছিলো কতক্ষণে ভোরের আলো ফুটবে।

আস্তে আস্তে যখন ভোরের আলো ফুটছে তখন ভেতরে যেন প্রাণ এলো। আমরা আর একদিন ওখানে থাকার কথা আর ভাবিনি। সকাল হতেই আমরা ঠিক করলাম আজই ফিরে যাবো। বেরোনোর জন্য মালপত্র সব গাড়িতে উঠানোর পালা চলছে, এমন সময় সরকারি এক উচ্চপদস্থ অফিসার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

আমরা ওখান থেকে রওনা হচ্ছি শুনে আমাদের নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কথায় কথায় গত রাতের ঘটনা আমাদের কাছে শুনলেন এবং শুনেই উনি বলেছিলেন যে আমরা যা দেখেছি তা ভুল নয় অমাবস্যার রাতে যাঁরাই এখানে কাটিয়েছেন তাঁদেরও ওই একই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

এ যুগে এরকম একটা ভূতের গল্প বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু অবিশ্বাসই বা করি কি করে। তবে সকলেই কি ভুল দেখলাম।

সলিল এ ব্যাপারে আর কোনো কথা বলতে চাইছিলো না। বার বার কথাটা ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। মন্দিরা, রত্না ওরাও রাত্রের কথা ভুলতে পারলেই ভাল। আমি মন থেকে কিন্তু ঘটনাটা কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিলাম না। আমাদের যদি দেখার ভুল তবে অফিসার ঐ কথা বললেন কেন? বাকি সবাই যখন গাড়ীতে মাল তোলাতে ব্যস্ত আমি তখন চৌকিদারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে ব্যাপারটা কি? চৌকিদার যা বলল সেটা এ রকম যে, অনেক বছর আগে এক পাদ্রী এসে এই গির্জায় থাকতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি কোন দেশীয় ছিলেন তা কেউ জানে না। তিনি ধর্ম প্রচার করতেন না। সে যে কোন ধর্মেরই লোক হোক না কেন, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলকেই সমান চোখে দেখতেন। সবাই তাদের দুঃখের কথা ওনার কাছে জানাত। উনি মন দিয়ে তা শুনতেন আর এক অলৌকিক শক্তির বলে সকলকার সমস্যার সমাধান করতেন। তাঁর নাম এত ছড়িয়ে পড়েছিল যে কাছাকাছি গ্রাম থেকে সব লোক আসতো তাদের কষ্টের কথা জানাতে। এদিকে মন্দিরের মাহান্ত বা মসজিদের পীরেরা এই ব্যাপারটা পছন্দ করছিলেন না। পাদ্রীবাবা কিছুদিনের মধ্যে অপঘাতে মার যান। সেটা অমাবস্যার রাত ছিল। অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে পা পিছলে বা কেউ পিছন থেকে তাকে ধাক্কা মেরে খাদের ভিতর ফেলেছিলো তা কেউ জানে না। খাদের ভিতরেই ওনার মৃতদেহ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর

আত্মা এখনোও অমাবস্যার রাতে গির্জায় আসে। আর যে কেউ গির্জাতে এখনো মোমবাতী জ্বালিয়ে গেলে তাদের আশা পূরণ করেন।

চৌকিদার যা বলল তা কি সত্য? এ প্রশ্নটা আজও আমার মনে বারবার আসে।

ফেলে আসা দিনগুলি

কেয়া দত্ত

এই বয়সে এসে মাঝে মাঝেই ছোট বয়সের অনেক স্মৃতি মনে পড়ে। যখন ভাবি তখন মনটা আনন্দে ভরে যায়। মনে পড়ে বাবা, মা, ঠাকুমা, দাদু, জ্যাঠা, জ্যোঠি, কাকা, কাকী আর আমার ছোট ভাই, দাদা, দিদিদের সঙ্গে কাটিয়ে আসা সুন্দর দিনগুলোর কথা।

ছিলাম এক একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভিতর হৈ হৈ আনন্দের মধ্যে দিয়ে দিনগুলো কিভাবে কেটেছে তা বুঝতেই পারিনি।

মনে পড়ে ছুটির দিন হলেই আমাদের বাড়ীর বাগানে ভাই, বোনেরা মিলে চড়ুইভাতি করতাম, তারপর রান্না করার জন্য ইট, মাটি সব দিয়ে নিজেরাই উনুন গড়তাম। রান্নাঘর থেকে বাসন, মশলা সব এনে সকলে মিলে রান্না করতাম। মা, কাকীমারা, উপরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের খেয়াল রাখতেন, বেশীক্ষণ দূরে থাকতে পারতেন না, নীচে এসে আমাদের সঙ্গে কাজে লেগে যেতেন। এই চড়ুইভাতি করে আমরা সকলে কী আনন্দটাই না পেতাম।

ঐ বাগানে খুব বড়ো একটা বেলগাছ ছিল, এখনো আছে। গরমের সময় সেই গাছে অনেক বেল হোত, সেই বেল দিয়ে বেলের পানার তৈরী করে তাতে বরফ দিয়ে দুপুরে বেলের পানার শরবৎ খাবার পালা চলতো। আবার ঐ বাগানে সন্ধ্যাবেলাতে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল। ঠাকুমা বলতেন সন্ধ্যাবেলায় এলোচুলে বাগানে যাবি না, বেলগাছে ব্রহ্মদত্যি থাকে। আমরা ভয়ে আর ওদিক মারাতাম না।

মনে পড়ে প্রতি রবিবার দাদু (ঠাকুদার) ভাই, বোনেদের নিয়ে আউট্রাম ঘাট, ভিক্টোরিয়া, ঘোরাতে নিয়ে যেতেন। তারপর সেখানে গিয়ে ফুচকা, চীনাবাদাম, ঝালমুড়ি সব খাওয়াতেন।

মনে পড়ে প্রথম স্কুলে যাওয়া কথা, কি কান্নাটাই না কেঁদে ছিলাম। রাগে দুইদিন বাবা, মার সঙ্গে কথা বলিনি। তারপর এমনই হয়েছে যে স্কুল বন্ধ থাকলে মন খারাপ লাগতো। শুধু বন্ধুদের জন্য নয়

টিচারদের জন্য ও মন খারাপ হোত, কারণ ওনাদের কাছে অনেক ভালবাসা পেয়েছি। গরমের সময় স্কুল একমাস ছুটি থাকতো। তখন ওনাদের চিঠি লিখতাম। ওনারাও সেই চিঠির উত্তর দিতেন। এখনো আমার কাছে সেই চিঠি আছে। স্কুল ছুটি পড়ার দিন আমরা বন্ধুরা মিলে বাড়ী থেকে যে যা পারতাম খাবার নিয়ে গিয়ে ছুটির শেষে সিঁড়ির উপর বসে খাওয়া হোত। এমন করতাম যেনো কতো বছর বাদে সব আবার দেখা হবে। এখন ভাবলে হাসি পায়। আমাদের বাড়ীতে মাস্টারমহাশয় পড়াতে আসতেন তাঁকে তাড়ানোর জন্য মাথাতে কতো বদবুদ্ধি না ঘুরতো। এখন নাতিরা কিছু করলে আমরা বকাবকি করি। তখন ভুলে যাই আমিও এক সময় ঐ রকম করেছি। একবার হয়েছিলো কী আমার খুড়তুতো ভাই পড়া না করার জন্য মাস্টারমশাইএর কাছে খুব বকুনি খেয়ে ছিল। তারপর তার এমন রাগ হল যে সে মাস্টারমশাই যে চেয়ারে বসেন সেই চেয়ারের বেতগুলো কেটে রেখে দিয়ে ছিল। পরের দিন যখন মাস্টারমশাই বসতে গেছেন আর অমনি ভিতরে ঢুকে গেছেন। কখন যে এই কাজটা সে করে রেখে দিয়ে ছিল তা আমরা কেউ বুঝতেও পারেনি। ব্যস আর যাবে কোথায়, কাকা, কাকীর কাছে মার বকুনি কিছুই বাদ যায়নি।

মনে আছ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর দিনের কথা। ভাল হলে ঠিক আছে। আর খারাপ হলে বকুনি খেতাম সকলের কাছে তখন মনে হতো আমার থেকে দুঃখী বোধহয় আর কেউ নেই, তখন তো আর বুঝতাম না গুরুজনেরা ভালর জন্য বলছেন।

মনে পড়ে দুপুর বেলা ছাদে গিয়ে আচার চুরি করে খাওয়ার কথা। আমাদের বাড়ীতে মা, জ্যোঠিমারা নানারকম আচার বানাতেন। আর সেই আচার বাড়ীর ছাদে রোদে দেওয়া হতো। দুপুরে যখন সকলে ঘুমাতো তখন আমরা ছাদে গিয়ে সেই আচার চুরি করে খেতাম। একবার ছাদের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে আমার দিদি ও আমি দুজনেই পড়ে যাই। তারপর হাত, পা কেটে একসা। আর ঠিক সেই সময় বাড়ীর কাজের লোক, নাম ছিলো তার “শুকো” ছাদে কাপড় তুলতে এসে আমাদের এই অবস্থা দেখে। তারপর সোজা একেবারে ঠাকুমার কাছে নিয়ে হাজির। ঠাকুরমা প্রথমে বল্লেন কীরে তোদের আচার খাওয়া হয়েছে। তারপর ঔষধ লাগিয়ে বল্লেন এখানে চুপ করে শুয়ে থাক। মার কাছে পাছে বকুনি খাই তাই নিজের কাছে শুইয়ে রাখলেন। বকুনির ভয়ে আমরা লক্ষ্মী মেয়ের মত শুয়ে পড়লাম, কিন্তু শুয়ে কি আর থাকা যায় লেগেছে তো খুব। সন্ধ্যাবেলায় বাবা হাইকোর্ট থেকে ফিরে এই অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলে কী করে এমন অবস্থা করলে? ঠাকুমা বল্লেন আরে বৌমারা রোদে আচার

দিয়েছে, সে গুলো ঠিক আছে কিনা দেখতে গিয়ে পড়ে গেছে। বাবা গম্ভীর ভাবে বলেন বড় হচ্ছো একটু দেখে শুনে চলা ফেরা কর। জ্যাঠা বল্লেন বাড়ীতে এতোগুলো কাজের লোক থাকতে তোমরা গেলে কেন? নিজেরাই তো কষ্ট পেলে। কিন্তু আমরা তো আর বলতে পারছি না যে আমরা আচার চুরি করতে গিয়েছিলাম। এরকম অনেক কিছু করেছি কিন্তু ঠাকুমার জন্য বেঁচে যেতাম উনি সব সময় নাতী, নাতনীদের আগলাতেন।

মনে পড়ে গরমের ছুটিতে সকলে মিলে মধুপুর যাওয়ার কথা মধুপুরে আমাদের তিনটে বাড়ী ছিলো, বাড়ীগুলো পাশাপাশি ছিলো। নাম ছিলো, লাভকট, পিসকট, হোপকট। সকলে মিলে অনন্ত পনেরো দিনের জন্য যাওয়া হত। এই মধুপুর নিয়ে আমি আগেও লিখেছি। সেখানে আনন্দ, গরুগাড়ী চেপে হাটে যাওয়া ওখানে শনি, মঙ্গলবার হাট বোসতো। সকলে মিলে হাট থেকে টাটকা, সবজি, মাছ, মুরগী, সব কিনে রান্না হত। হাটেতে দেখতাম গরু, ছাগল, কচ্ছপ, মাটির হাঁড়ি, সব বিক্রি হত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা

কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ী

বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি।

সত্যই এই দৃশ্য হাটে গেলে দেখা যেতো। মনে পড়ে শীতকাল হলে পিকনিক যাওয়া, বাড়ীর সকলে দিদিরা, জামাইবাবুরা, পিসে, পিসি সব নিয়ে তিরিশ পঁয়তিরিশ জন লোক হতই। তারপর কাজের লোকেরাও আছে প্রথমে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন সব খেলা কেউ কেউ তাস নিয়ে বসতো। আবার কিছু লোক চাষের জমিতে গিয়ে আনাজ তুলতো। মাঝে ঝালমুড়ি ও তেলে ভাজা খাওয়া। তারপর যার বাড়ী তাদের পুকুরে জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরতো। পোনা, ভেটকি টেংরা এই সব। তারপর আমাদের ভুদোঠাকুর রান্না করতো মাংসটা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হত। ভুদোর হাতের মাংসের স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে।

মনে পড়ে পয়লা বৈশাখের কথা ঘুম থেকে উঠে তৈরী হয়ে জ্যাঠামশাই এর হাত ধরে সব দোকানে ঘোরা। যেখানেই যেতাম তারা হাতে একটা করে খাবারের বাক্স কোল ড্রিংক্স ও ক্যালেন্ডার ধরিয়ে দিতো। সবাই চেনা তাই না যেতে পারলেও বাড়ীতে বাক্স পাঠিয়ে দিত। সকাল থেকে মাইকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজতো, সন্ধ্যাবেলাতে দেখতাম জ্যাঠিমা, মা, কাকীমা এরা যে দোকান থেকে বারোমাস কাপড় কিনতেন সেই

দোকানে কিছু টাকা দিয়ে কাপড় কিনে আনতেন। দোকানের শুভলাভের জন্য।

এরপর আসতো জামাইষষ্ঠি, ঐদিন সকাল থেকে বাড়ীর সকলে খুব ব্যস্ত থাকতো, রাত্রে জামাইরা সব নিমন্ত্রণ খেতে আসতেন। মা, জ্যাঠিরা কতো, মেহনত করে সব রান্না করতেন বড়ো বড়ো চিংড়ির চিনেকাবাব, ভেটকির ফ্রাই, তোপসে মাছ, ইলিশ পোলাও, মাংস, লুচি, চাটনি, নিরামিষ আর লিখলাম না। মিষ্টি সব সেরা সেরা দোকান থেকে আসতো নলেনচন্দ্র, ভীমনাগ, এইসব দোকানের মিষ্টি, তার উপর ছানার পায়েস বা রাবড়ী। তারপর জামাইরা খেতে বসার আগে শাশুড়ীরা ফল, মিষ্টি, কাপড় সব দিয়ে আর্শীবাদ করতো, জামাইরাও শাশুড়ীদের কিছু না কিছু দিতো।

মনে পড়ে রথযাত্রার কথা আমাদের বাড়ীতে ছোট ছোট রথ ছিলো। রথের দিন আমরা রথ টানতাম, সকালবেলায় সকলে মিলে লাল, নীল, কাগজ দিয়ে রথ সাজিয়ে সন্ধ্যাবেলাতে সেই রথে মোমবাতী লাগানো হত তারপর কেউ রথ টানতো কেউ কাঁসর বাজাত, তারপর পাঁপড়ভাজা, হালুয়া, বেগুনী এই সব খাওয়ার সঙ্গে মঠ খাওয়া হত (মঠ এক রকমের চিনির তৈরী জিনিষ)।

মনে পড়ে রাখী পূর্ণিমাতে আমরা ভাইদের হাতে রাখী বাঁধতাম কিন্তু ঐ সময় এখনকার মত এত সুন্দর রাখী পাওয়া যেত না। ঐ একটা মোটা সূতোর মতন দেখতে সেটাই সকলকে পরানো হত। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে উড়িষ্যার যে বামনঠাকুর রান্না করতো তার নাম ছিলো ভুঁদো, সেই ভুঁদোঠাকুর সকলের হাতে রাখী পরাতো।

মনে পড়ে বিশ্বকর্মাপূজার কথা সকাল চারটে থেকে কাঁসর আর ভোকাট্টার শব্দে ঘুম ভেঙে যেত। সকলে মিলে সকাল থেকে ছাদে। আমার বাবা খুব ভালো ঘুড়ি ওড়াতেন, বাবা সেদিন কোর্ট থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে ছাদে চলে যেতেন। বাবাকে দেখে সকলে চ্যাঁচাতো আরে বুলিদা এসেছে আর রক্ষা নাই। সারাদিন ছাদে থেকে হৈ হৈ করার পর সকলেই ক্লান্ত হয়ে যেত, তাই সাতটার ভিতর সকলেই রাত্রের খাবার খেয়ে নিত। গরম গরম লুচি, ছোলার ডাল, বেগুন ভাজা আর মাংস।

মনে পড়ে দূর্গাপুজার কথা মহালয়ার দিন ভোর চারটেয় সময় উঠে হাতে চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দাতে সকলের সঙ্গে বসে

বীরেন্দ্রকৃষ্ণভদ্রের গলায় চন্ডীপাঠ শোনা। এখনো ওনার গলা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়, কী উদার কন্ঠ।

পূজার আগে থেকেই আমাদের বাজার করা আরম্ভ হয়ে যেত। মা, কাকীমারা নিউমার্কেট থেকে সব বাজার করতেন। বাড়ীতে দরজি আসতো তার নাম 'রহমত' সে আমাদের ফ্রক স্কার্ট সব বানাতো। কখনো মায়েরা নিজেরাও বানাতেন। তারপর বাটা থেকে নতুন জুতো কেনা হতোই তা ছাড়া হরিমুচী বলে একজন লোক বাড়ীতে আসতো, যে বাড়ীতে বসেই চটি বানায়ে দিতো। সপ্তমীর দিন থেকে ঠাকুর দেখা শুরু হয়। দশমীর দিন বাড়ীতে সিদ্ধি তৈরী করা হত। ছোটদের একচামচ করে দিতো। আর বড়রা গ্লাস ভরে খেতো।

এরপর কালীপূজা। কালীপূজার আগের দিন ভূতচতুর্দশীতে চৌদ্দশাক খাওয়া আর চৌদ্দপিদিম জ্বালা এটাতো হতই, না হলে যে ভূতে ধরবে। ছোট বয়সে জানি না ঐদিনটা মনে হতো আশে পাশে ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে। পূজার দিন সারা বাড়ী আমরা প্রদীপ দিয়ে সাজাতাম। কাজের মাসিরা সলতে পরাতো আর তেল ঢালতো প্রদীপে, আর আমরা নতুন জামা পরে সেজে গুজে ঐ প্রদীপ গুলো জ্বালাতাম। বাড়ীতে দাদারা ও তাদের বন্ধুরা মিলে তুবড়ী তৈরী করতো। সন্ধ্যাবেলাতে সেগুলো জ্বালান হত, তুবড়ীর ওপর কে কোনটা বানিয়েছে নাম লেখা থাকত। পরে প্রতিযোগিতা হতো কারটা ভাল হয়েছে। তারপর বাজী পোড়ান। কত বাজী আসতো। আমার আওয়াজ একদম ভাল লাগে না, সারা সন্ধ্যা কানে আঙুল দিয়ে বসে থাকতাম। আমাদের বাড়ীর কাছেই ঠনঠনে কালীবাড়ী। পূজার সময় অনেক পাঁঠা বলি হত। পরের দিন ঐ মাংস আসতো বাড়ীতে পেঁয়াজ, রসুন ছাড়া সেটা রান্না হত, তারপর ঠাকুর দেখতে যাওয়া, ঠাকুর যতো না দেখতাম মায়ের সাথে তার চেলা চামুন্ডা, ডাকিনি, যোগিনি সব কেমন হয়েছে সেটাই দেখতাম। রাত্রে ওইগুলোর মুখ মনে পড়লে বেশ ভয় ভয় করত।

তারপর আসতো ভাইফোঁটা, বাড়ীর দালান আলপনা দিয়ে তার উপর রূপার থালা, গ্লাস সাজিয়ে ভাইদের খেতে দিতাম। ভাইদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে প্রতিবারের মত বলতাম ভাইএর কপালে দিলাম ফোঁটা। এরপর সকলের কাছ থেকে উপহার পেতাম।

মনে পড়ে খ্রীষ্টমাসের কথা ঐ সময় চিড়িয়াখানা যাওয়াটা একটা যেনো রেওয়াজ ছিল। সেখানে যাওয়া মানেই সঙ্গে করে এক গাদা খাবার বাড়ী থেকে নিয়ে যাওয়া হত। কমলালেবু, সান্ডুইচ, মাছের চপ, চিকেন

কাটলেট, কেক ইত্যাদি। তখন ভিতরে কোন দোকান ছিল না। তারপর সেখানে গিয়ে বাঘের গায়ের দুর্গন্ধ দূর থেকে পাওয়া, হাতির পিঠে চড়ে ঘোরা, বাঁদরকে কলা খাওয়ান এই সব চলত। খ্রীষ্টমাসের দিন আমরা খুব আনন্দ করতাম কোথাও না কোথাও যাওয়া হত। পার্কস্ট্রীট এর আলোক সজ্জা দেখার মতোন হত। আমার দাদুর অনেক মক্কেল ছিলো তারা ভাল ভাল কেক, পেটি, চকলেট সব পাঠাতেন।

পৌষসংক্রান্তির দিনটাও মনে পড়ে, বাড়ীতে নানা রকম পিঠে তৈরি হত। পুলিপিঠে, গোকুলপিঠে, ছানার পিঠে, দুধপুলি আরো কত কী। সকাল থেকে রাত অবধি খালি পিঠে খাওয়া। বাড়ীতে সেদিন আর অন্য খাবার হত না।

মনে পড়ে যখন একটু বড়ো হলাম, চৌদ্দ, পনের বছর বয়স, সেই সময়ে সরস্বতীপূজার কথা। আমাদের স্কুলে দুটো পুজো হতো। উপরে মেয়েরা পূজা করতো। আর নিচে ছেলেদের পূজা হত। ঠাকুরের আলপনা সাজান সব টিচার ও ছাত্রীরা মিলে করা হত। সেই সময় ছেলেগুলো কিছু না কিছু বাহানা করে উপরে আসতো। আমরা তাদের পিছনে লাগতেও ছাড়তাম না। তারপর সকলে মিলে আড্ডাতো হতই, টিচাররা আমাদের সিঙাড়া, জিলিপি, চা সব আনিয়ে খাওয়াতেন।

একবার এরকম কতোগুলো ছেলে এসেছে, আমরা কথা বলছি, সেই সময় আমার জ্যাঠতুতো দাদা সেখানে এসে পড়ে আর যাবে কোথায় ছেলেদের সঙ্গে কথা বলা দেখে তার তো মাথা খারাপ বয়ে গেলো। আমাকে সোজা টানতে টানতে বাড়ী। বাড়ী থেকে আমার স্কুল মাত্র পাঁচ মিনিট তারই ভিতর কতো কী যে শুনলাম তার ঠিক নেই আসলে আমাদের বাড়ী ভীষণ পুরানপন্থী। বাড়ীর উল্টো দিকে বিদ্যাসাগর কলেজ তাই আমাদের বারান্দাতে বেশী দাঁড়াতে দেওয়া হত না

মনে পড়ে দোল উৎসবের কথা বাড়ী শুদ্ধ সকলে দোল খেলতো একটা বড় টিনের টবে রং গুলে তাতে সবাইকে চান করান হত। তার নাম “চৌবাচ্চায়” চান। আর চালুনিতে ফাগ ঢেলে সকলের মাথায় দেওয়া হত তার নাম “ছাঁকামাল” এই ভাবে ছোট ছোট আনন্দ, দুঃখ সব নিয়ে সুন্দরভাবে ছোট বয়সটা কাটিয়ে এসেছি। তবে সব থেকে মনে পড়ে ভোরবেলায় প্রতিদিন দাদু গাইতেন

ওঁ অসতো মা সত গময়।
তমশ মা জ্যোর্তি গময়।।

আর একটা প্রেয়ার করতেন।

Our father in heaven ,

Hollowed be the name .

এটা হয়তো বিশ্বাস হবে না। কিন্তু আমার কানে এখনো বাজে।

নীল নদের ধারে

কেয়া দত্ত

আড্ডাটা জমেছিল ভালো। সৌমিত্র, শম্পা, সলিল ও আমি। বসেছিলাম আসওয়ানে "আইসিস আইল্যান্ড" হোটেলে। ভারী সুন্দর এই ছোট দ্বীপ আইসিস তার পুরোটা জুড়েই এই হোটেল। দুদিকে দিয়ে নীল নদ বয়ে চলেছে। ফেব্রুয়ারীর প্রথম হাল্কা শীত। জলের ধারে মিষ্টি রোদের তলায় আমাদের আড্ডাটা দারুণ লাগছিল।

আমাদের আড্ডার বিষয় ছিল নীল নদ আর মিশর নিয়ে। আমার মনে আছে, ছোটবেলায় পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন আসতো, সেটা হলো "মিশরকে নীলনদের দান বলা হয় কেন?" ভাবতেও অবাক লাগছে যে আজ আমি সেই নীলনদের মধ্যে বসে আছি, তাকে দেখছি। কিন্তু তখন থেকেই আমার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল যে নীলকে নদ বলা হয় কেন? আমি প্রশ্নটা তুলতেই সৌমিত্র খুব সহজেই বলে দিল, নদ হচ্ছে নদীর পুংলিঙ্গ। পরে সলিল ইন্টারনেট ঘেঁটে জানালো যে নদ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, নদীর পুংলিঙ্গ হিসাবে, যার পিছনে কোনো লজিক নেই।

তিন চার দিন আগে আমরা মুম্বাই থেকে কায়রোতে এসেছিলাম। কায়রোর সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলো চরকীর মতো ঘুরে, এখানে এসেছি বিশ্রাম নেবার জন্য। আমাদের এই ঘুরে বেড়ানোর সম্পূর্ণ সুন্দর ব্যবস্থা করেছিল সৌমিত্র।

কায়রোতে পৌঁছেই আমরা প্রথমে পিরামিড দেখতে যাই। পিরামিডের সামনে দাঁড়িয়ে সে এক অদ্ভূত অনুভূতি। ইতিহাসের পাতায় পড়েছি – পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম এইসব পিরামিড। এই পিরামিড তৈরী হয়েছিল পাঁচহাজার বছর আগে। গীজাতে আমরা তিনটে পিরামিড একসঙ্গে দেখলাম। আর এদের পাহারা দিচ্ছে "স্ফিংস" এর স্ট্যাচু – যার শরীরটা সিংহের মত আর মাথাটা মানুষের মত। এখানে আমরা "লাইট এন্ড সাউন্ড" দেখালম। এক কথায় অতুলনীয়। সব থেকে প্রথম যে পিরামিড তৈরী হয় সেটা হচ্ছে "স্টেপ পিরামিড" এটার নাম "সাকোয়ারা"। আমাদের গাইড আরমানী বললো, এই পিরামিডগুলো তখনকার দিনের রাজাদের ক্ষমতার প্রতীক। এখানে সব থেকে বড় যে

পিরামিড তার উচ্চতা সাড়ে চারশো ফিট। এটা তিরিশ লক্ষ বড় বড় পাথরের ব্লক দিয়ে তৈরী। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না এতো বড় বড় পাথর কিভাবে অত উঁচুতে তুলেছিল? কারণ তখনকার দিনে তো আর ক্রেন ছিলো না। তা গাইড বললো, তখন প্রতি বছর নীল নদে ভীষণ বন্যা হতো, আর ঐ পাথরগুলো তাতে ভেসে আসতো। তখনকার দিনে দাসপ্রথা ছিলো আর এইসব হাজার হাজার দাসদের দিয়ে পিরামিডের সমস্ত কাজ করানো হয়েছিল। পুরোনো আমলে যে নীল নদের বন্যা সাংঘাতিক রূপ ধারণ করতো তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আসওয়ান বাঁধে যে জলাশয় তৈরী হয়েছে তার ব্যপ্তি এক সাগরের মত। সারা মিশরের সেচের জল, বিদ্যুতের চাহিদা আসওয়ান বাঁধ থেকেই মেটানো হয়। শুনলাম এই বাঁধের সব জল যদি একসঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে কয়েকঘন্টার মধ্যে সারা মিশর ভেসে যাবে। ফিলের যে মন্দির আমরা দেখলাম সেটা আগে যেখানে ছিল সে জায়গাটা এখন জলের তলায়। ইউনাইটেড নেশান একটা একটা করে পাথর সরিয়ে এই মন্দিরকে নতুন জায়গায় বসিয়েছে।

পাঁচহাজার বছর আগে যখন সারা পৃথিবীতে হানাহানি, কাটাকাটি সেই সময় নীলনদের ধারে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে সেটা যেন বিশাল মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস বা মরুদ্যান। এখানেই মানুষের প্রথম লেখার সূত্রপাত হয়। প্রথমে ওরা ছবি এঁকে লিখতে। এটাকে “হেয়ারোগ্রাফি” বলা হয়। এখানেই সমস্ত সংস্কৃতির মিশ্রণে মানবসভ্যতার জন্ম হয়।

মিশরের রাজাদের যে প্রচুর ঐশ্বর্য ছিল তা আমরা তুতানখামেনের ঐশ্বর্য দেখে বুঝলাম। কায়রোতে যে ইজিপ্সিয়ান মিউজিয়াম আছে, তার একটা ঘর শুধু তুতানখামেনের জিনিস দিয়ে ভরা। শুধু তাল তাল সোনা আর গয়না। তবে অন্য রাজাদেরও যে ঐশ্বর্য কম ছিল তা নয়, তবে তাদের কবরগুলি লুঠ হয়ে গেছে। কিন্তু কোন কারণে তুতানখামেনেরটা লুঠ হয়নি। আমি আর শম্পা তো ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। এইসব দেখে মনে হলো তৎকালীন রাজারা জীবনের থেকে মৃত্যুর সময়টা নিয়েই বেশি চিন্তা করতেন।

কায়রো থেকে তিন চার ঘন্টার জার্নি “আলেকজান্দ্রিয়া”। এক সুন্দর ছোট্ট শহর। সমুদ্রে নীল সবুজ রং-এর জলের মিশ্রণ। “আলেকজান্দ্রা দ্য গ্রেট”-এর স্বপ্ন ছিল উনি সারা পৃথিবী জয় করে একটি সাম্রাজ্যে পরিণত করবেন। কিন্তু উনি বেশিদিন বাঁচেননি। মিশরের যে বন্দরে উনি রাজধানী গড়েছিলেন সেটাই এখন আলেকজান্দ্রিয়া বলে সবাই জানে। ওখানে আমরা রোমান থিয়েটার দেখলাম। এটা দেখতে অনেকটা রোমের

“কলোসিয়াম”-এর মতো। মিশরের শেষ রানী ক্লিওপেট্রা একটিয়ামের যুদ্ধে হেরে গিয়ে আত্মহত্যা করেন। এরপরই এখানে রোমের আধিপত্য আরম্ভ হয়।

এরপর আমরা তিনদিনের জন্য নীলনদের বুকে একটা ক্রুজ নিয়েছিলাম। ভেসে চলেছিলাম আমরা নীল নদের বুকে। জাহাজের নাম “সেরেনাড”। ভারী সুন্দর এই জাহাজ। বড় বড় হোটেলের সমস্ত সুযোগ সুবিধা এতে ছিল। ডেকে বসলে নীল নদের দুই ধার অপূর্ব লাগছিল। তবে একদিক ছিলো রুক্ষ, অপর দিক ছিলো সবুজ। সেইজন্য একদিকের নাম হলো “ভ্যালি অব কিং” আর অপরদিকের নাম হলো “ভ্যালি অব কুইনস”।

সেরেনাডের ডেকের আড্ডায় সলিল সৌমিত্র দুজনেই আমাকে জিজ্ঞেস করলো মিশরের কি কি আমার ভাল বা মন্দ লেগেছে। আমি বললাম – মন্দ বলতে এখানকার এই ধুমপানের বহর আমার মোটেই ভাল লাগেনি। যদিও এতে আমাদের সৌমিত্রর খুব সুবিধা হয়েছে তবুও। চারিদিকে শুধু “হুক্কাবার”। মহিলারাও কেমন পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে হুক্কা টেনে চলেছে। তবে একটা জিনিস ভাল যে অন্য ইসলামিক দেশের তুলনায় এখানকার মহিলারা অনেক স্বাধীন।

এখানকার খাবার ভারতীয় রান্নার থেকে বিশেষ আলাদা নয়, তবে ঝলসানো খাবারই বেশি। এখানকার বাজারে দেখলাম খুব দরদস্তুর চলে। কায়রোতে “খান-এল-খলিল” বাজারে এসে মনে হলো সময় যেন এখানে কয়েক শতাব্দী ধরে আটকে আছে। একটা মজার কথা বলি – আমাদের মুখ দেখে বাজারে সবাই ইন্ডিয়ান বুঝতে পেরে চিৎকার শুরু করলো “এই এই হাবিবা” মানে (ডারলিং) অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান ইত্যাদি। মনে হলো এখানে বলিউডই ভারতের পরিচয়।

গীজার বিশ্ববিখ্যাত পিরামিড ছাড়াও মেমফিসের স্টেপ পিরামিডও খুব ভাল লেগেছে। মন্দিরের ভেতর “লাক্সার টেম্পল”, “করণাক টেম্পল”, “ফিলে টেম্পল”, “কমওমবো টেম্পল” ও “এডফু টেম্পল” খুবই সুন্দর। তবে প্রত্যেকেরই একটা নিজস্বতা আছে।

ইসনাতে লকগেটে জাহাজটা কেমন উঁচু জলের লেভেল থেকে নীচু লেভেলে এল সেটাও দেখার একটা অভিজ্ঞতা হলো। আর যেটা আমার একেবারে ভাল লাগেনি সেটা হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত “বেলি ডান্স”। ভাল লাগেনি হাবসী টাঙ্গাওয়ালের দরদাম নিয়ে বড্ড ঝামেলা করা।

আমাদের ক্রুজ শেষ হলো “লাকসারে”। লাকসার এয়ারপোর্ট থেকে ফ্লাইট ধরবো কায়রোর জন্য। সেখানে আরও তিন/চার ঘন্টা অপেক্ষার পর ধরবো মুম্বাই –এর ফ্লাইট। এমন সুন্দর সফরের শেষে মনটা একটু বিমনা হয়ে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু মুম্বাইতে ফিরেই প্রিয়জনের মুখ দেখতে পাবো ভাবতেই মনটা আনন্দে ভরে উঠলো।

মধুপুরের স্মৃতি

কেয়া দত্ত

মধুপুর – আহা চোখ বন্ধ করলে এখনও সেই সুন্দর ছোট্ট শহর ও তার সব কথা মনে পড়ে যায়। সেই নীল আকাশ, দূরে পাহাড়, ছোট ছোট গ্রাম, সামনে দিয়ে নদী বয়ে চলেছে। সবুজ মাঠ, মাঠের মাঝখান দিয়ে কালো পিচের রাস্তা চলে গেছে। কিছু দূরে চাষের জমিতে চাষীরা চাষ করছে। খড়ের চাল দেওয়া মাটির সব কুঁড়ে ঘর তার উপর আবার আলপনা আঁকা। সন্ধ্যাবেলাতে আকাশপ্রদীপ জ্বালাতো কিছু কিছু বাড়িতে। দূর থেকে মনে হতো যেন জোনাকী জ্বলছে। এই হলো ছোট্ট শহর মধুপুর।

স্কুলে যখন পড়তাম তখন গরমের ছুটি কবে হবে আমরা সেই আশাতে বসে থাকতাম। প্রথমত পড়াশোনার চাপ থাকতো কম, তারপর সাতসকালে উঠে স্কুল যেতে হতো না। আর তার থেকেও আনন্দ হত যে বাড়ীর সকলে মিলে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যাওয়া হতো।

তখনকার দিনে এই বাইরে যাওয়াটাকে চেঞ্জে যাওয়া বলা হত। এটা আমি প্রায় ৫০ বছর আগেকার কথা লিখছি। ঐ সময় লোকে এখনকার মতো কথায় কথায় বিলেত, আমেরিকা ঘুরতে যেতো না, এমন কী দিল্লী, বম্বের কথাও ভাবতো না। তাই কলকাতার কাছাকাছি যেসব জায়গা আছে সেখানেই যেতো। যেমন মধুপুর, দেওঘর, শিমূলতলা, জসিডি এই সব জায়গাতে।

আমরা বেশীরভাগ মধুপুর যেতাম। আমার ঠাকুরদা, বাবা লইয়ার ছিলেন। ওই সময় হাইকোর্ট বন্ধ থাকতো। তাই ছুটি তে ঠাকুদা, বাবা, কাকারা সকলে একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া হতো।

আমার ঠাকুরদারা মধুপুরে তিনটে বাংলো করেছিলেন। বাংলোগুলোর নাম আমার এখনো মনে আছে। লাভকট, পিসকট, হোপকট। বাংলোগুলো ভীষণ সুন্দর ছিলো যেন ছবির মতো। গেট দিয়ে ঢুকেই বাগান। বাগানে নানান রকমের ফুলের গাছ - আম, লিচু, নারকেল ইত্যাদি। বাগান ছেড়ে দুটো সিঁড়ি উঠেই ছিলো বসার ঘর সেটা আবার বড় বড় ঝাড় লন্ঠন দিয়ে সাজানো। দেয়ালে পেন্টিং, কাটগ্লাসের বাতিদান – তাতে বাতি লাগানো। সাদা মার্বেলের টেবিল, সব জিনিস খুব সুন্দর।

বসার ঘরের পাশেই শোবার ঘর চারটে করে, তারপর কিচেন ও বারান্দা। একটু দূরে চৌকিদারের ঘর। চৌকিদার আর ওর ফ্যামিলি ওখানে থাকতো। ওরা ওখানকার লোক ছিল – সাঁওতাল। আমাদের একান্নবর্তী পরিবার তাই যখন কোথাও যাওয়া হতো তখন ঠাকুরদা, ঠাকুমা, বাবা জ্যাঠা, কাকা, জাঠতুতো, খুড়তুতো ভাইবোনেরা সব একসঙ্গে যাওয়া হতো। এমন কী পিসিমারাও যেতেন। তখন যে কী আনন্দ আর হৈ হৈ হতো তা বলার নয়। সকলে গিয়ে ঐ বাংলোতেই ওঠা হতো। তা ছাড়া একটু দূরেই আমার পিসিমারও একটা বাংলো ছিলো, ওখানেও অনেকে উঠতো।

আমার মনে আছে যাবার আগের দিন রাত্রি অবধি সব গোছগাছ করা হতো। তাস, গল্পের বই, ক্রিকেট ব্যাট, কোনটা যেন বাদ না পড়ে। আর তার সঙ্গে বই খাতা তো আছেই। মা, কাকিমারা তাড়া লাগাতেন তাড়াতাড়ি শুতে যাবার জন্য কারণ পরের দিন সকাল সকাল উঠতে হবে। কিন্তু শোব কী, কখন সকাল হবে, আর কখন ট্রেনে চড়ে বসব, তার অপেক্ষাতেই রাত্রি শেষে ভোর হয়ে যেতো।

স্টেশনে পৌঁছে যে ট্রেনে মধুপুর যাবো সেই ট্রেনে চড়ে বসা হতো, কী ট্রেনে যেতাম তা এখন আর আমার মনে নেই। কলকাতা থেকে ঘন্টা চারেক লাগতো মধুপুর পৌঁছাতে। মধুপুর স্টেশনে নেমেই তিন, চারচে টাঙ্গা ভাড়া করে সকলে তাতে চড়ে বসতাম, আর আমাদের সঙ্গে যে কাজের লোকেরা যেতো, তারা মালপত্র নিয়ে গরুর গাড়ি করে আমাদের পিছনে পিছনে আসতো। টাঙ্গা করে যেতে যেতে বাইরে সুন্দর দৃশ্য দেখতাম আগেই যা লিখছি – মাঠ, ঘাট, পাহাড় সব থেকে মজা লাগতো দেখতে জমিতে কতরকম সব্জী হয়ে থাকতো।

স্টেশন থেকে বাড়ী পৌঁছাতে আধ ঘন্টার মতো সময় লাগতো। দূর থেকে টাঙ্গার শব্দ শুনে চৌকিদার, মালী সব বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো। আর একটা ছোট্টো ছেলে কালুয়া যে আমাদের চৌকিদারের ছেলে, ও একেবারে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো। আর আমরা পৌঁছালেই এসে আমাদের জরিয়ে ধরতো। আর তার যে কী আনন্দ হতো আমরা গেলে সে আমি বোঝাতে পারব না। বাড়ীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কালুয়ার মা চামেলী আমাদের সকলের জন্য আম পোড়ার সরবত করে নিয়ে আসতো।

ঠাকুরদা, বাবা, কাকারা সকলে ওদের ওখানকার খবরাখবর নিতেন। কলকাতা থেকে আমাদের ঠাকুমা, মা এরা এদের জন্য জিনিস নিয়ে যেতেন সব দেওয়া হতো। আর কালুয়া ওর জন্য কী আনা হয়েছে,

সেটা দেখার জন্য অপেক্ষায় থাকতো। জামাকাপড়, খেলার জিনিস, খাওয়ার জিনিস দেখলে খুব খুশী হতো আর যদি দেখতো বই খাতা আনা হয়েছে তাহলে ওর মনটা একটু দমে যেতো। কালুয়ার বয়স আট বছর কিন্তু ও খুব চালাক চতুর ছিল – ও আমাদের সকলেরই খুব প্রিয় ছিল। মধুপুরে যাবার আনন্দটা ওর জন্য আরো বেড়ে যেতো।

ছোট হলে কী হবে কালুয়া কাজ করতো অনেক। পাতকুঁয়ো থেকে জল তোলা, বাবা কাকাদের ফরমাস খাটা, অল্প সবজী আনা, এইসব কাজ। গরমের সময় বলে গাছে প্রচুর আম হতো। কালুয়া তরতর করে গাছে উঠে পেড়ে আনতো, আর আমরা সেই আম কুচি করে চটকে তাতে সরষের তেল, লঙ্কা, মিষ্টি মেখে সকলে মিলে খেতাম। সারাদিন খেলাধূলো করে সন্ধ্যেবেলায় কিন্তু পড়তে বসতাম। কালুয়াও আমাদের সাথে পড়তে বসতো। রোজ সকালে উঠে আমাদের ঠাকুরদা আমাদের নদীর ধারে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। ওনারও হাঁটা হতো আর আমাদেরও ঘোরা হতো। ওখানে নদীর ধারে ফিরিওয়ালা অনেক কিছু বেচতো, কিন্তু ঠাকুরদা (দাদু) কিছু কিনে দিতেন না। বলতেন এসব খেলে শরীর খারাপ হবে। খালি চিনেবাদামের বেলায় কিছু বলতেন না। কলকাতাতেও দেখেছি ভিক্টোরিয়াতে বা ইডেনগার্ডেনেও যখন যেতাম ঐ একই ব্যাপার – চিনেবাদাম ছাড়া কিছু দেবেন না। আর আমাদের ভাইবোনেদের চোখ থাকতো কোথায় ফুচকা, কোথায় আলুকাবলী এইসব দিকে।

যাই হোক বাড়ী ফিরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সেই যে হুল্লোড় আরম্ভ হতো তা একেবারে শেষ হতো সন্ধ্যেবেলায়। ৬টার ভিতর সকলেই কিন্তু পড়তে বসতাম, তারপর খেয়েদেয়ে শোয়া। বাবা, কাকারা সন্ধ্যেবেলায় সকলে বসে চুটিয়ে আড্ডা দিতেন, গান হতো। আমার মা পিসিমা বেশ ভাল গান গাইতে পারতেন। আমরা পড়া করতে করতে তাঁদের গানও শুনতাম। ঐ সময় ওনারা ঠিক করতেন পরের দিনের কী খাওয়ার মেনু। আমার মা ভীষণ ভালো রান্না করতেন এবং নানারকম রান্না করতে পারতেন তাই দায়িত্ব ওনার উপর ছিল। জ্যেঠিমা ভাঁড়ারের দায়িত্ব নিতেন। আর কাকিমা সব ফলটল কাটা ইত্যাদি।

আমি যে সময়ের কথা লিখছি, সেই সময় যারা মধুপুর গেছেন তাঁরা জানবেন যে মধুপুরে খুব বহুরূপী আসার চল ছিল তখন। বহুরূপী হচ্ছে একজন মানুষ নানারকম সেজে পয়সা রোজগার করতো। কখন কালী, কখন ডাকাত, কখন রাক্ষসী – এইসব সাজতো।

একবার সন্ধ্যা হবো হবো আমরা তখনও বাগানে সকলে খেলছি এমন সময়ে বহুরূপী রাক্ষসী সেজে এসেছে, আমরা তো ভয়ে আধমরা আর কালুয়া হেসে অস্থির। কারণ ও তো ব্যাপারটা জানতো। আমরা রেগে কালুয়াকে খালি মারতে বাকী রেখেছিলাম। একটু বাদেই দেখি সেই রাক্ষসী সাজা বহুরূপী আমাদের বাবা, কাকাদের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছে। ঠাকুরদা তাকে জিজ্ঞাসা করতেন তার এই কাজ কেমন চলছে। এই টাকাতে সংসার চলে কিনা এইসব। পরেরদিন সকালে দেখি সেই লোকটাই সাধারণ ভাবে এসেছে আর আমাদের হাতে লজেন্স দিয়ে বলছে – এই নাও তোমরা এটা করে লজেন্স খাও। কাল আমাকে দেখে খুব ভয় পেয়েছিলে তাই না? এবার বুঝেছো তো আর ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদেরই মতো একজন।

মধুপুরে বুধবার আর শুক্রবার হাট বসতো। সেটাও একটা দেখবার মতো শাক, সবজী, চাল, ডাল থেকে আরম্ভ করে গরু, হাঁস, মুরগী পাখী, মাটির বাসন, সবই সেই হাটে বেচা হতো। আমরা খুব কাঁচের চুঁড়ি, কাঁচপোকার টিপ কিনতাম। খুব হৈ হৈ করে হাটে বাজার করা হতো। এবার বলি কালুয়া কী করতো। হাট থেকে আমরা অনেক শাক সবজী কিনতাম। আর কালুয়া সেই শাকগুলো নিয়ে গলাতে মালার মতো করে পড়ে গরুর গাড়ির উপরে উঠে গাড়ি চালাত আর ওদের ভাষায় গান গাইতো। ওকে দেখে আমাদের সকলের হাসি আর থামত না।

বাড়ী ফিরে মুরগী কেটে সবজী সব রান্না করে খাওয়া হত। আমাদের বাড়ীতেও চারটে মুরগী ও হাঁস পোষা হত, তারা ডিম দিতো – সেই ডিম আমরা খেতাম।

এইভাবে আনন্দ হৈ হৈ মাঝে মাঝে মা বাবাদের বকুনি এইসবের ভিতর দিয়ে কখন যে এক মাসের ছুটি শেষ হয়ে যেতো তা বুঝতেই পারতাম না। কলকাতা ফেরার সময় হয়ে যেতো। আমাদের সকলেরই মন তো খারাপ হতই, কালুয়াও কাঁদতে বসে যেতো। এইভাবে অনেক বছর আমরা ছুটিতে মধুপুর বেড়াতে গেছি। আমার যখন পনেরো বছর বয়স তখন শেষ যাই। তখন কী আর জানতাম এই শেষ যাওয়া, কারণ কিছুদিন পর শুনেছিলাম ঠাকুরদা বাড়ী বিক্রি করে দিচ্ছেন। মনে ভীষণ কষ্ট হয়েছিল।

সকলে কালুয়াকে খুব মিস করতাম। পুরানো কথা হলেই ওকে আমাদের মনে পড়ে। এখন তো কালুয়াও অনেক বড় হয়ে গেছে। শুনেছি

ও নাকি এখন কলকাতাতে কোথায় একটা পিয়নের চাকরী করে। কলকাতার রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে কখনো যদি কালুয়া আমার সামনে এসে পড়ে তাহলে কী আমি আর ওকে চিনতে পারবো, না ও আমাকে দিদি বলে চিনতে পারবে?

সেকালের শিষ্টাচার

কেয়া দত্ত

সুমিতা আর দুর্গাবাড়ীর সদস্যরা আমাকে অনুরোধ করেন বাড়ীর পূজা নিয়ে এবারের সুভেনিরে কিছু একটা লিখতে। হাটখোলা দত্ত বাড়ীর পূজায় আমার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা আগে লিখেছি ২০০৮ সালের পত্রিকায়। তখন বন্ধুরা বললেন অন্ততঃ সেকালের কথা নিয়ে কিছু লেখো।

ভাবছিলাম কি লিখি? এমন সময় বাড়ীতে টি.ভি. খুলতেই দেখি আন্না হাজারে আর তাঁর “ভ্রষ্টাচার বিরোধী” আন্দোলন নিয়ে সারাদেশ যেন মেতে উঠেছে। তখনই আমার মনে হলো শিষ্টাচার নিয়ে কিছু লিখলে কেমন হয়? সেকালের শিষ্টাচারের কথা আমার শ্বশুরবাড়ীতে শুনেছি শাশুড়ীমায়ের কাছে। আজ যেখানে টাকাই মানুষের আসল পরিচয়, সেকালের এই শিষ্টাচারের কথা শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে।

হাটখোলার দত্তবাড়ীর সেকালে বেশ নাম ডাক ছিল – এখনও কিছু কিছু আছে। দত্তবাবুরা না কি বাদশাহ শাহজাহানের সময় থেকে কলকাতায় বাস করছেন। ওনারা সূতানটীর সম্পত্তির জন্য কোনদিন খাজনা দেননি। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ট দেব বাহাদুর সূতানটী গ্রামের জমিদারি কিনে নেন। কিন্তু দত্তবাবুদের কাছে বাদশাহী ফরমান থাকায় ওনারা দেব পরিবারকে খাজনা দেন নি। ঐ সময় থেকে হাটখোলার দত্তরা এবং বড় বাজারের বসাকরা ও শেঠরাই শুধু কলকাতার বসবাস করেছেন। আমার স্বামী ও ছেলে দত্ত পরিবারের ২৭তম ও ২৮তম পুরুষ।

যে সময়ের কথা লিখছি, সেই সময় আমাদের এই পরিবারের মদন দত্তর খুবই নাম ডাক ছিল। খুব মোটা সোটা কিন্তু সাধাসিধা মানুষ ছিলেন তিনি। শিষ্টাচারের তাঁর তুলনা মেলা ছিল ভার। অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে মদনবাবুর জাহাজেরও একটি ব্যবসা ছিল। সেই ব্যবসা দেখাশুনা করতেন রামদুলাল সরকার নামে এক ভদ্রলোক – যিনি অনাথ অবস্থায় শিশুকাল থেকে দত্তবাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছিলেন। রামদুলালবাবু খুবই বিচক্ষণ লোক ছিলেন – তার যেমন ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তেমনি সৎ ও পরিশ্রমী।

মদনবাবু তার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা করতেন। তিনি মাসে দশটাকা মাইনে পেতেন।

একদিন রামদুলালবাবু খিদিরপুরে গেছেন কোনো মহাজনকে ১৪০০০ টাকা দেবার জন্য। তখন হঠাৎ দেখেন একটা ডুবো জাহাজের নিলাম হচ্ছে। বেশী খদ্দের ছিল না। তিনি দত্তবাবুর ঐ চোদ্দ হাজার টাকা দিয়ে জাহাজটি কিনে নিলেন। কিছুক্ষণ পরেই এক সাহেব এসে জাহাজটির খোঁজ করছে কেনার জন্যে। কিন্তু ততক্ষণে রামদুলালবাবু কাগজ পত্র পেয়ে গেছেন। সাহেব তখন এসে বললেন আমি একলক্ষ চোদ্দ হাজার টাকা দিচ্ছি তুমি জাহাজটা আমাকে দিয়ে দাও। রামদুলালবাবু তৎক্ষণাৎ জাহাজটি বেচে দিলেন সাহেবকে। জাহাজে অনেক তামা আছে একথা সাহেবটী জানতেন।

সন্ধ্যার সময় রামদুলালবাবু মদনবাবুর কাছে এক লক্ষ চোদ্দ হাজার রেখে সব ঘটনাটা বললেন। আর এও বললেন এই সব টাকাই হুঁজুর আপনার, তারপর নিলামে ডাক দিয়েছিলাম আপনারই টাকা নিয়ে। তাছাড়া আপনার অনুমতি ছাড়াই এই কাজ করেছি, তাই ক্ষমা চাইছি।

সব শুনে মদনবাবু অবাক হয়ে গেলেন বললেন, দেখ বাপু এই এক লক্ষ টাকা নিতে আমার শিষ্টাচারে বাঁধছে। এই টাকাটা ভাগ্যলক্ষী তোমাকে পাইয়ে দিয়েছে। তুমি এই টাকাটা দিয়ে জাহাজের ব্যবসা শুরু করো। তবে একটা সর্ত আছে। তুমি আমার চাকরী ছাড়তে পারবে না, আর আমার জাহাজের ব্যবসাটাও তোমাকেই দেখাশুনা করতে হবে।

রামদুলালবাবু ঐ মূলধনেই ব্যবসা শুরু করেন। তখনকার এক লক্ষ টাকা হয়ত এখনকার একশ কোটি মত হবে। কিছুদিনের মধ্যে রামদুলালবাবুর ব্যবসা ফুলে ফেঁপে বিরাট হয়ে যায়। তাঁর মেজ মেয়ে বিমলার নামে তিনি যে জাহাজ কেনেন, সেটি কলকাতা থেকে আমেরিকা পর্য্যন্ত যাতায়াত করতো। এই পরিবার পরে 'দেব' পদবী নেন।

ছাতুবাবু ও লাটুবাবু এই পরিবারের। তখনকার বাবু সমাজে তাঁদের খুব নাম ডাক হয়। তাদের ঠাকুরবাড়ীতে বাজি পোড়ান হত – সে এক দেখার মতন। আমরাও ছোট বয়সে কালীপূজার দিন ছাতে উঠে দেখেছি। কত ধরনের বাজি – সেসব এখন আর দেখা যায় না।

মদনবাবু যেমন শিষ্টাচারী ছিলেন রামদুলালবাবুরও শিষ্টাচার কিছু কম ছিল না। নিজে কোটিপতি হয়েও প্রতিমাসে গোড়ায় দত্তবাড়ী

থেকে অনেক দূরে জুড়ি গাড়ী দাঁড় করিয়ে খালি পায়ে মদনবাবুর কাছে আসতেন তাঁর দশটাকা মাইনে নিতে। আজীবন তিনি মদনবাবু জাহাজের ব্যবসার দেখাশুনা করেছেন দশটাকা মাসিক বেতনে।

এই দেব পরিবারের মেয়ে স্নিগ্ধা আমাদের ভাগ্নে-বৌ হয়েছে। সেও এইসব গল্প তার গুরুজনদের কাছে শুনেছে।

আজকের দিনে কি আমরা এই শিষ্টাচারের কল্পনা করতে পারি।

একটি আরাম কেদারা

কেয়া দত্ত

আমি "একটি আরাম কেদারা" এই গল্পটা কিন্তু আমাকে নিয়েই লেখা। কি খুব অবাক হচ্ছেন তো? ভাবছেন এ আবার কী ধরনের গল্প! কত রকম গল্পতো পড়েছি কিন্তু এরকম গল্পতো আগে কখনো পড়িনি।

তবে আসুন এবার আমার আত্মকাহিনী আপনাদের জানাই।

আমি ছিলাম মুর্শিদাবাদের নবাবের মহলে। আমার বয়স হয়েছে। কিন্তু যে দেখে সেই বলে আমাকে দেখতে নাকি খুব সুন্দর। বুঝতেই পারছেন নবাববাড়ীর ঘরের শোভা বাড়াতে গেলে সুন্দর তো হতেই হবে। আমার চারটে পা রুপো দিয়ে মোড়া। আমার পিঠে সুন্দর কারুকার্য্য করা আছে তাতে নানা রকম পাথর বসানো। আমার ওপর বসার জন্য যে গদি আছে তা মখমল দিয়ে মোড়া এবং তার উপর শলমা-চুমকীর সব কাজ। যেই আমাকে দেখে সেই মুগ্ধ হয়ে যায়।

এই নবাব মহলের ঘরে বসে আমি অনেক কিছুই দেখেছি। ভাল মন্দ সব কিছুরই অভিজ্ঞতা আমার আছে। মন্দ যেমন নিজেদের ভিতর ঝগড়া, রক্তপাত, আবার ভালও অনেক দেখেছি বিশেষ করে ঈদের সময় বড় থেকে ছোট অব্দি সকলে এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে সকলের মঙ্গল কামনা করত। মহলে প্রচুর লোক নিমন্ত্রিত হতো। নানারকম খাবার তৈরি হতো, খাওয়াটাও একটা দেখার মতন ব্যাপার ছিল। একটা বড় থালাতে চার/পাঁচজন মিলে বসে খেত। থালার মাঝখানে থাকত বিরিয়ানি আর তার চারপাশে থাকতো কাবাব, তন্দুরী, মিষ্টি তো নানারকম থাকতই কিন্তু তার ভেতর ফিরণীও ওরা সব সময়ই খেত।

নবাব বাড়ীর মেয়েদের সেদিন সাজ দেখার মতো। হীরে জহরতে নিজেদের তারা মুড়ে রাখতো।

নবাবের খাসমহলের যে ঘরে আমি থাকতাম সেই ঘরে নিমন্ত্রিতরা এসে বসতেন। কিন্তু আমার উপর নবাব ছাড়া আর কারো বসার অধিকার ছিল না।

এই নবাবেরই এক জমিদার বন্ধুর আমাকে খুব পছন্দ হয়। তিনি নবাবকে বলেন, ‘এই রকম আমার ও একটি “আরাম কেদারা” চাই।’ নবাবের নবাবিয়ানা, তিনি শোনা মাত্র বন্ধুকে বললেন ‘বন্ধু আমার এই প্রিয় জিনিসটি আমি তোমাকে উপহার দিলাম।’ ব্যাস আর কী, এবার আমার সময় হলো মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে যাবার। এবার আমি এলাম নবাব মহল থকে জমিদারবাবুর ঘরের শোভা বাড়াতে। আমার নতুন মনিব হলেন জমিদার আদিত্য নারায়ণ। এই জমিদারবাবু কিন্তু আমাকে খুবই যত্নে রেখেছিলেন। ওনার খাস চাকর আমার দেখাশোনা করতো। ওনার হুকুমে রোজ আমাকে পরিষ্কার করা হতো, আমার গায়ে কোথাও যেন কোন ধূলো ময়লা না থাকে। আমার মখমলের গদীর উপর যেন কোন দাগ না থাকে। জমিদারবাবু যখনই এই ঘরে আসতেন আমার উপর বসে আরাম উপভোগ করতেন। আমার তাতে খুব গর্ব বোধ হতো। জমিদারবাবু লোক ভীষণ ভাল ছিলেন। তাঁর প্রচুর প্রতিপত্তি ছিল। তিনি সব সময় প্রজাদের সুখ সুবিধের উপর নজর রাখতেন। প্রজাদের সুখে তিনি খুব আনন্দ পেতেন, আবার প্রজাদের দুঃখে তাঁর প্রাণ কাঁদতো। উনি নিজে খুব ঠাকুরভক্ত ছিলেন, তাঁর প্রাসাদের সঙ্গে যে মন্দির ছিল সেখানে রোজ সকালে উঠে তিনি পূজা করতেন।

এই জমিদারবাবুর একটি সখ ছিল। প্রাসাদে তিনি অনেক পায়রা পুষে ছিলেন আর রোজ সকালে উঠে নিজের হাতে তাদের দানা খাওয়াতেন। তারপর সন্ধ্যাবেলাতে তিনি পায়রা ওড়াতেন। এত পায়রা একসঙ্গে আকাশে উড়তো কিন্তু সকলেই আবার ঠিক টাইমে ঘরে ফিরে আসতো। কেউ পথ ভুলে অন্যত্র চলে যেত না। এদের আবার এক এক জনের এক একটা নাম ছিলো কারো নাম গোলা, কেউবা নোটন, ঝটন, আবার কেউ বা লক্কা। তারা কিন্তু বাড়ীর ভিতর ঘুরে বেড়াত। কেউ কেউ ঘুরতে ঘুরতে আমার নিচে এসে বসতো আর বকম্ বকম্ করে নিজেদের ভিতর কথা বলতো। ওদের ভাষা আমি বুঝতাম না। কিন্তু আমার ছায়াতে বসে থাকত সেটাই আমার খুব ভাল লাগতো।

এই জমিদারবাবুর স্ত্রী ছিলেন করুণাময়ী, তাঁর নামের সঙ্গে তাঁর স্বভাবের খুব মিল ছিল। তাঁর দয়ার শরীর ছিল। কারো দুঃখ তিনি সইতে পারতেন না। দারোগা যখন কোন অপরাধীকে জমিদারবাবুর কাছে নিয়ে আসতো অপরাধের সাজা দেবার জন্য, করুণাময়ী পরদার আড়ালে বসে সব শুনতেন, আর বলতেন, ‘ওকে ছেড়ে দাও, ভুল করে ফেলেছে।’ জমিদারবাবু অপরাধীকে বুঝিয়ে ছেড়ে দিতেন। আমি তখন ভাবতাম

নবাবের মহল হলে এর চেয়ে বড় সাজা দেওয়া হতো। মাপ করা তো দূরের কথা।

এই রকম একটা সুন্দর পরিবেশের ভিতর দিয়ে দেখতে দেখতে আমার পঁচিশ বৎসর কেটে গেলো এই জমিদার বাড়ীতে। জমিদারবাবুর, রাণীমা সকলেরই বয়স হয়েছে। এখন তাঁরা বৃদ্ধ, বৃদ্ধার পর্য্যায়ে পড়েছেন। আর তার সঙ্গে আমারও বয়স পঁচিশ বছর বেড়েছে। বেশ ভালই ছিলাম। কিন্তু বেশিদিন আর ভাল থাকতে পারলাম কই। দিনকাল খারাপ হতে লাগলো। গর্ভরমেন্ট সব জমিদারদের জমিজমা হাত করলো। কলসির জল গড়াতে গড়াতে কতদিন আর তা থাকবে? জমিদারবাবুর একটি পুত্র, সে বাইরে থেকে পড়াশোনা করতো। দেশের সব কথা জেনে সে দেশে ফিরলো। নাম তার রুদ্রনারায়ণ। তাঁর দেশে ফেরার চার বছরের ভিতর জমিদারবাবু চোখ বুঝলেন। রাণীমার মৃত্যুর পর রুদ্রনারায়ণ বিদেশে ফিরে যাবার ঠিক করেন। তখন বাড়ী ঘরের আসবাব পত্র একে একে বিক্রি করতে থাকেন। আমিও তার হাত থেকে রেহাই পেলাম না। আমার সমস্ত স্মৃতি এই জমিদার বাড়ীতে রেখে আমি বিক্রি হয়ে গেলাম অন্যের হাতে। সে আমাকে নবাব বা জমিদার বাড়ীর মত রাখলো না। আমার গায়ের রুপো খুলে বাজারে বেচে দিল। যে আমি এতো সুন্দর ছিলাম, আমাকে দেখে লোকে মুগ্ধ হয়ে যেত, এখন আমার সেই হাল হয়েছে কঙ্কালের মত। সে এখন আমাকে একটা অন্ধকার ঘরে ভাঙ্গা আসবাব পত্রের সঙ্গে ফেলে রেখেছে। আমি জানি না এরপর আমার কী হবে? হয়তো ভাঙ্গা কাঠের সঙ্গে জ্বালানির জন্য সে আমাকে বিক্রি করে দেবে। অথবা যদি সম্ভব হয় আমাকে ঠিকঠাক করে আবার কারো ঘরের শোভা বর্ধনের জন্য বেচে দেবে আমায়।

হলুদ পাখী

কেয়া দত্ত

সকালবেলায় রোজ উঠে দেখি আমার ঘরের জানালার উপর সুন্দর দুটো পাখী এসে বসে থাকে।

পাখী দুটো বড়ই সুন্দর, তাদের গায়ের রং হলুদ, গলার কাছটা নীল আভা, ল্যাজটা খুব বড়। একটার আবার মাথার উপর কাকাতুয়ার ঝুটির মত ঝুটি আছে।

এদের কি জাত, কোথা থেকে আসে কিছুই বুঝতে পারতাম না।

প্রথম দিকে অতটা গুরুত্ব দিইনি। পরে অবাক হতাম তাদের দেখে যে রোজই সকালে দুটো পাখী একই জায়গায় এসে বসে কি করে? তারা যেমন আমার জানলাতে আসত আমারও তাদের দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে সময় কেটে যেত বুঝতে পারতাম না। আমি এদের নাম দিয়ে ছিলাম 'হলুদ পাখী'। আমি দেখতাম তারা অনেকক্ষণ বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলতো। আবার কখনও ঝগড়া করত। এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে তাকাত। আর আমি কাছে গেলে ভাবত আমার হাতে কিছু খাবার আছে। তাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসত। এরকম রোজ দেখতে দেখতে আমারও তাদের উপর একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। আমার মনে হয় ওদেরও নিশ্চয়ই আমার কাছে আসতে ভাল লাগত। তাই তার নিয়ম করে সকালবেলা রোজ আমার জানলাতে এসে বসত। আমি ওদের জন্য বাটি করে জল রেখে দিতাম জানলাতে। তারপর ওরা এলে ওদের ধনে পাতা ও গাজর, পাউরুটি সব খেতে দিতাম। ধীরে ধীরে ওরা আমার বন্ধুর মত হয়ে গেল। আমার হাতের একদম কাছে আসতে লাগল। তবে আমি ওদের কখনও ধরার চেষ্টা করিনি।

হলুদ পাখীরা চলে গেল আমি জানলা দিয়ে অনেক দেখার চেষ্টা করেছি। যে কাছাকাছি ওদের কোথাও বাসা আছে কিনা। কিন্তু কিছুই দেখতে পাইনি। হয়তো কাছেই যে পাহাড় ও জঙ্গল আছে সেখানে ওরা থাকে। রোজ সকাল হলে উড়ে আসে আমার কাছে।

এইরকম দেখতে দেখতে প্রায় একমাস পেড়িয়ে গেল। ওরা আমার বন্ধুর মত হয়ে গিয়েছিল। ওদের আসতে দেরি দেখলে আমার মন খারাপ হয়ে যেত। সকালেই উঠে প্রথম চোখ পরতো জানলাতে। যদি দেখতাম হলুদ পাখীরা আসেনি তাহলে অপেক্ষা করতাম তাদের জন্য। কখনো হয়তো আবার দেরি হত আসতে, কিন্তু তারা আসতো একবার করে।

এইভাবেই দিন কাটছিল, তারপর গ্রীষ্ম পেরিয়ে বর্ষার সময় এলো। বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি, ঝড় আমার খালি মনে হতে লাগলো, এতো বৃষ্টিতে ওরা কী করে আসবে? দুই তিন দিন কাটল তাদের দেখা নেই। বাড়ীর কাজের ফাঁকে ফাঁকে জানলায় গিয়ে দেখতাম যদি তাদের দেখা পাই। কিন্তু না দেখতে দেখতে দেড় মাস কেটে গেল তাদের দেখা নেই। বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ করে দেখি একটা হলুদ পাখী এসেছে আমার জানলাতে যার মাথায় কাকাতুয়ার মত ঝুঁটি আছে। আর একটা কোথায়? ওতো আর কথা বলতে পারে না যে তাকে জিজ্ঞাসা করব তোমার সঙ্গিনী কোথায়? আমি দেখতাম ও এসে কী যেন খুঁজতো, হয়তো তার সঙ্গিনীকেই খুঁজতো। আমার মনে হয় এই ঝড় জলে সে হয়তো আর নেই। নিঃসঙ্গ পাখী একা একা কতদিন আর আসবে। আট, দশদিন আসার পর সেও আসা বন্ধ করে দিল। কতদিন আমি তার জন্য জানলাতে অপেক্ষা করেছি একবার যদি সে আসে। কিন্তু না সে আমার কাছে ফিরে আসেনি। দুটো সুন্দর হলুদ পাখী আমাকে ছেড়ে চলে গেলো। আর কী কোন দিন আমি তাদের দেখতে পাবো? মনে হত আমার জীবন থেকে কী যেনো একটা হারিয়ে গেলো। একবার যদি তাদের দেখা পাই তবে আর ছাড়বো না। যত্ন করে খাঁচাতে রেখে দেবো। শুনেছি যারা বাড়ীতে পশু, পাখী সব রাখেন তাদের উপর নাকি খুব মায়া পরে যায়। কিন্তু আমি তো আর হলুদ পাখীদের পুষিনি। তাও তারা আমার এতো কাছের হয়ে গেলো কী করে? আজও আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে তাদের খুঁজি। আর ঠাকুরকে জানাই ওদের একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি একবার তাদের দেখতে চাই। কিন্তু কি জানি সে ইচ্ছা কী আর আমার পূরণ হবে? তবে আমি ওদের দেখার আসা ছাড়বো না। রোজ জানলাতে একবার করে দেখবো আমার হারিয়ে যাওয়া হলুদ পাখীরা এলো কী না।

বাবুদের খামখেয়ালীপনা

কেয়া দত্ত

আগে অনেক বার পুরানো দিনের কথা লিখেছি। এবারে ভাবলাম, আগেকার দিনের জমিদারদের খামখেয়ালীপনা নিয়ে কিছু লিখি। মনে মনে ভাবছি – শোনা কথা লিখলে পূর্বপুরুষদের অসন্মান করা হবে না তো? কর্তা বললেন – 'অত ভেব না – যা শুনেছ লিখে ফেল।' অভয় পেয়ে আমার শ্বাশুড়ি আর খুড়শ্বশুরদের মুখে শোনা কিছু গল্প যেমন শুনেছি তেমন লিখছি।

মদন দত্ত তখনকার দিনের কোটিপতি লোক ছিলেন। তাঁর অনেক রকম ব্যবসা ছিল – জাহাজের, আমদানির রফতানির। কলকাতার মদন দত্ত লেনের বুড়ো শিবতলার মন্দির তিনি নির্মাণ করে। বুড়ো শিবতলার শিবলিঙ্গ এত উঁচু যে সিঁড়ি দিয়ে চড়ে শিবের মাথায় জল ঢালতে হয়।

মদন দত্ত খুব মোটাসোটা মানুষ ছিলেন। একবার গয়া গিয়ে প্রেতশিলা পাহাড়ে উঠতে গিয়ে তিনি এমন হাঁফিয়ে পড়েন যে সেদিন আর পিন্ডদানের কাজ করতে পারেন নি। পরের দিন খুব ভোরে উঠে পিন্ডদান সম্পূর্ণ করতে হয় তাঁকে। তখন তাঁর মাথায় এলো যে সেখানে সিঁড়ির দরকার। অনেক টাকা খরচ করে উনি প্রেতশিলা পাহাড়ে সিঁড়ি তৈরী করিয়ে দেন।

তিনি নিজে কিন্তু খুব সাধাসিধে ভালোমানুষ ছিলেন। মোটা কাপড়, মোটা চাদর আর পায়ে খড়ম পড়ে থাকতেন। কিন্তু মান সন্মান বোধ খুব ছিল। একদিন তাঁর বাড়ী সামনে এক উঠতি বড়লোক বাড়ীর সরকারমশাই পাঁচজন কুলির মাথায় একটি আয়না নিয়ে যাচ্ছিল – তখনকার দিনে ল্যাজারস নামের খুব নামকরা এক দোকানের আয়না। মদন দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, – 'কি নিয়ে যাচ্ছেন মশাই?' সরকারমশাই একবার ঘাড় ঘুরিয়ে বিশ্রী করে বললেন – 'এ তোমাদের মত লোকেদের জন্যে নয়।' বলেই হনহন করে এগিয়ে চলে গেলেন।

মদন দত্ত তাঁর লোকেদের ডেকে বললেন, 'যা তোরা ওই কুলিগুলো আর সরকারমশাইকে ধরে নিয়ে আয়।' লোকেরা ছুটে গিয়ে ওদের ধরে আনলো। আয়নাটাকে মাটিতে নামিয়ে রাখার পরে মদন দত্ত জিজ্ঞেস

করলেন – ‘এবার বল এটার দাম কত।’ ‘পাঁচশ টাকা, বুঝেছেন’ – সরকার মশাই মুখ বেঁকিয়ে বললেন।

তখনকার দিনের পাঁচশ মানে এখনকার অনেক টাকা। মদন দত্ত আবার জিজ্ঞেস করলেন – ‘আয়নাটা মজবুত তো?’

খোদ বিলেত থেকে আনা, মজবুত হবে না মানে? – সরকার মশাই খুব গর্বের সঙ্গে উত্তর দিলেন।

তখন মদন দত্ত খড়ম পায়ে আয়নাটির উপর দিয়ে হেঁটে গেলেন। মুড়মুড় করে ভেঙ্গে চৌচির বিলেতের আয়না। ‘করেন কি? করেন কি? আর আমার চাকরি থাকলো না।’ সরকার মশাই নিজেকে সামলাতে না পেরে কেঁদে ফেললেন।

তখন মদন দত্ত খাজাঞ্চিকে ডেকে বললেন – ‘যাও, ওকে পাঁচশ টাকা দিয়ে দাও’ আর ক্রন্দন রত সরকার মশাইকে থামিয়ে বললেন – ‘শুনুন, এবার থেকে ভদ্রভাবে সবার কথার জবাব দেবেন। আর পোশাক দিয়ে কোনো মানুষের বিচার করবেন না।’ অসভ্য একটি লোককে উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে হঠাৎ এককাঁড়ি টাকা খরচ করাটা খামখেয়ালীপনা ছাড়া আর কি? আজকের দিনে কি একথা ভাবা যায়?

এই মদন দত্তের এক নাতির নাম তিনুবাবু। তিনি খুব সৌখিন লোক ছিলেন।তাঁর খুব আতরের শখ ছিল। তিনি ইস্তানবুল থেকে আতর আনিয়ে মাখতেন। শোনা যায় ওনার বাড়ী ঘর মোছা হত সেই আতর মাখানো জল দিয়ে।

তখনকার দিনে এক রাজা ছিলেন বৈদ্যনাথ। তাঁর জমিদারিতে এক ব্রাহ্মণ প্রজা এসে একদিন বললেন – ‘আমার কানে পুঁজ হয়েছে – কবিরাজ বলেছেন কানে আতর লাগাতে। আমি আতর নেবার জন্যে এই পাত্র নিয়ে এসেছি। আমি ভিক্ষা চাইছি আপনার কাছে।’ বৈদ্যনাথ দেখলেন আতর নেবার জন্যে সে নিয়ে এসেছে এক বড় গামলা। ব্রাহ্মণের আক্কেল দেখে তো বৈদ্যনাথ অবাক। তখনকার দিনেও ভালো ইস্তানবুল আতর কিনতে গেলে একভরির জন্যে দাম দিতে হত পাক্কা একটি সোনার মোহর। বৈদ্যনাথ বাবুর মাথায় তখন এক দুষ্টু বুদ্ধি এলো। তিনি ভাবলেন এবার তিনুবাবুকে একটু জব্দ করা যাক।

এই প্রসঙ্গে বলি, তখনকার দিনে সব জমিদার কিন্তু রাজা খেতাব পেত না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে টাকা দিয়ে এই খেতাব কিনতে

হত। একমাত্র শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই মহারাজা খেতাব কিনেছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ইউরোপে গিয়ে নিজেকে প্রিন্স বলে পরিচয় দিয়েছিলেন কিন্তু ঠাকুর বাড়ীর ও শুধুই জমিদারী ছিল, কোনদিন রাজা খেতাব পাননি তাঁরা। দত্ত বাবুরা ও কোনদিন রাজা খেতাব পাননি। কিন্তু তিনুবাবুর খরচ করার বহর দেখে ছোটখাটো অনেক রাজাই তিনুবাবুর উপর মনে মনে রাগ পুষতেন।

বৈদ্যনাথ বাবু ভাবলেন একবার তিনুবাবুর সঙ্গে একটা টক্কর নেওয়া যাক, তখনকার দিনে রেষারেষির খুব চল ছিল। তাই বৈদ্যনাথবাবু ব্রাহ্মণকে খুব মিষ্টি করে বললেন – 'আপনি তিনুবাবুর কাছে যান। ওনার মত আতরের সমঝদার আর কেউ নেই। তাছাড়া তিনুবাবু কোনো ব্রাহ্মণকে কখনো খালি হাতে ফেরান না।'

ব্রাহ্মণ তখন তিনুবাবুর কাছে গিয়ে সবিস্তারে যা কথা হয়েছে সব বললেন। তিনুবাবু ভালই বুঝতে পারলেন বৈদ্যনাথের চালটা। এক গামলা আতর ব্রাহ্মণকে দিয়ে বললেন – 'যাও, তোমার রাজাকে দেখিয়ে নিও এটা সত্যিকারের ইস্তানবুলের আতর কিনা।' শুধু টক্কর নেওয়ার জন্যে গামলা ভরা দামী পারসী আতর দান করা – খামখেয়ালীপনা ছাড়া আর কি?

শুধু বাবুরাই নয়, কর্মচারীরাও এইভাবে টক্কর নিতে পিছিয়ে থাকতেন না। হরসুন্দর দত্তের সরকারমশায়ের এই গল্পটা শুনুন। প্রায় দুশো বছর আগে তখন নতুন বাজারের (আজকের চিৎপুর রোড) খুব নামডাক ছিল। হরসুন্দর দত্তের সরকারমশাই বড়বাজার কাঠরায় ভাড়া তুলতে যাবার পথে নতুনবাজারে ঢুকলেন। একটি বিরাট কুমড়ো তাঁর খুব পছন্দ হয়ে গেল। আধমণের ও বেশী ওজন সেই কুমড়োর। তিনি দোকানদারের সঙ্গে এক টাকার রফা করলেন। দোকানদারকে বললেন – 'তুই এটা সরিয়ে রাখ, আমি বড়বাজার থেকে ফেরার পথে এটা নিয়ে যাব।'

ফেরার সময় দেখলেন সেই দোকানের সামনে একটু গোলমাল হচ্ছে। দেখলেন এক বাবু ঐ কুমড়োটি কিনতে চাইছেন। দোকানি বলছে – 'অন্য নিন বাবু। এটা আগেই বিক্রি হয়ে গেছে।' সেই নিয়ে তর্ক। সরকার মশাই চিনতে পারলেন সেই বাবুকে – উনি তখনকার দিনের রাতারাতি কোটিপতি হওয়া শীলবাবু।

সরকার মশাই বলেন – ‘ও কুমড়ো আগে আমার সঙ্গে রফা হয়েছে, ওটা আমি নেব।’ ‘কত টাকায় রফা হয়েছে?’ শীলবাবু দোকানিকে জিজ্ঞেস করেন। ‘এক টাকা’ দোকানদার তাড়াতাড়ি কুমড়ো সরকারমশায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে। ‘উনি যা দেবেন আমি তার থেকে এক টাকা বেশি’ শীলবাবু দোকানিকে থামাতে যান। ‘এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না’– সরকারমশাই ক্ষুব্ধ হন। শীলবাবু বলেন – ‘কেন, তুমি জানো না – যার লাঠি তার মাটি, আর যার টাকা তার জিনিস’। দুই জনের রেষারেষিতে কুমড়োর দাম বাড়তে থাকে। সরকারমশায়ের কাছে বড়বাজার থেকে পাওয়া একহাজার টাকা ছিল। মরিয়া হয়ে অগত্যা তিনি কুমড়োর এক হাজার টাকা দাম হাঁকলেন। তখন শীলবাবু ক্ষান্ত হলেন। সরকারমশায় মুটের মাথায় এক হাজারী আধমণ কুমড়ো নিয়ে ফিরলেন। সব শুনে তিরস্কার তো দূরের কথা, হরসুন্দর দত্ত সরকারমশায়কে খুব সাবাসী দিলেন। ওই এক হাজার টাকায় কেনা কুমড়ো দিয়ে রান্না হলো কুমড়োর ছক্কা। লুচি আর সেই ছক্কা দিয়ে তিনি মহানন্দে ব্রাহ্মণসেবা করলেন।

এইরকম খামখেয়ালীপনার আরো অনেক গল্প আছে। তবে এক হাজার টাকার কুমড়োর গল্প বহুদিন অব্দি লোকের মুখে মুখে শোনা যেত।

ফেরিওয়ালা

কেয়া দত্ত

এই আধুনিক যুগে যে জিনিস গুলো আমাদের জীবন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তাদের ভিতর ফেরিওয়ালারাও পড়ে। তারা রাস্তায় রাস্তায় হাঁক দিতে দিতে জিনিস বিক্রি করে। সেই হাঁক কিন্তু এখন আর বিশেষ শোনা যায় না।

আগেকার দিনে কলকাতার রাস্তাতে রোজই নানা রকম ফেরিওয়ালাদের হাঁক শোনা যেতো। আগে তো আর ইন্টারনেট বা শপিং মলে জিনিস কেনা ছিল না। তাই আমাদের কেনাকাটার ব্যাপারে অনেকটাই তাদের উপর নির্ভর করতে হতো। যে যেটা বিক্রি করতো। সে সেই নামেতেই হাঁক দিতে দিতে যেতো।

এখন কলকাতার পুরোনো রাস্তাতে বা গলিতে একজন বা দুজনকে দেখলেও দেখতে পাওয়া যেতে পারে। এই হাঁকগুলো কিন্তু আমরা এখনো ভুলে যেতে পারিনি। এখনো আমাদের কানে বাজে।

সকাল হতে না হতেই শোনা যেত মিষ্টিওয়ালাদের হাঁক–মাগো কৃষ্ণনগরের শরপুরীয়া, শরভাজা আছে নেবে মা? তার হাঁক শুনে বাড়ী বাড়ীর দরজা খুলে যেতো। সকলের হাতে থাকতো একটা করে এ্যালমোনিয়ামের থালা বা বাটি। সকলেই খুব উৎসাহ নিয়ে মিষ্টি কিনতো, তারপরেই এসে যেত আরেক জন। দুই কাঁধে মিষ্টির হাঁড়ি, ঝুলিয়ে তাতে থাকতো নানা রকমের মিষ্টি যেমন ছানার জিলিপি, চন্দ্রপুলী, চিত্রকূট, তিলকূট ইত্যাদি।

আর শীতকাল হলে তো কথাই নেই, এরপরেই এসে যেত, মোয়া বা গুড়ওয়ালা, জয়নগরের মোয়া আর পয়রা গুড়। আহা গরম লুচির সঙ্গে পয়রা গুড় খেতে কি ভালই না লাগতো। এরা যখন বাড়ী ফিরতো তখন এদের হাঁড়িতে আর কিছু থাকতো না, সব বিক্রি হয়ে যেত। এরপর একটু বেলা বাড়তেই শোনা যেত রদ্দিওয়ালাদের ডাক পেপারওয়ালা পেপার শিশি বোতল পেপার। তার পিঠে থাকতো বড়ো একটা চটের থলি। তার ভিতর থাকতো দাঁড়িপাল্লা ও বাটকারা, এইগুলো দিয়ে ওজন করে জিনিস নিতো। এই রদ্দিওয়ালাদের সঙ্গে বাড়ীর বাবুদের বা ছেলেদের

ঝগড়া লেগেই থাকতো। সে যে দর বলতো বাবুরা তার থেকে দ্বিগুণ দাম বলতো এই নিয়ে তর্কাতর্কি, শেষে রদ্দিওয়ালা যখন বলতো ঠিক আছে অন্য জায়গায় বিক্রি করুন বলে উঠে পড়তো তখন বাবুদের টনক নড়তো। তাকেই বাবা বাছা করে সেই কাগজ বিক্রি করতো। এটা থামতে না থামতেই এসে যেত শিলকাটাওয়ালারা শিল কাটাউ, শিল কাটাউ করে হাঁক দিতে।

আগেকার দিনে তো আর মিক্সি ছিল না, তাই শিল নোড়াতে বাটনা বাটা হতো। শিলে বাটনা বাটতে বাটতে শিলটা ক্ষয়ে যেতো। তখন সেটাকে কাটাতে হতো। এই শিল কাটাওলা শিল কাটতে কাটতে তার উপর নানা রকম নক্সা বানাতো। পাখী, আলপনা, মাছ, আমরা বসে বসে অবাক হয়ে দেখতাম।

এরপর দুপুরের খাওয়া দাওযা হতে না হতেই মা, কাকীমাদের মন আনচান করে উঠতো। একটা হাঁকের অপেক্ষায় কিসের হাঁক বলুন তো? সেটা শাড়ীওলা, বা শাড়ীওলির হাঁক। ধনেখালীর ভালো ভালো শাড়ী, রঙ্গীন, ডুরে, গঙ্গাযমুনা সব রকম পছন্দের শাড়ী আছে গো মা, বাবুদের জন্য সরেষ জমির ধাক্কা দেওয়া ধূতিও পাবেন। দেখে মনে ভরে যাবে। দেখেন মা, বৌদিরা দেখেন।

আবার কেউ শান্তিপুরের জরি শাড়ী বিক্রি করতো। এই শাড়ীওলীর নাম ছিল উষা। আমরা উষামাসী বলতাম। উষামাসীর নিজের তাঁত ছিলো ও আমাদের জন্য ছোট, ছোট পুতুলের শাড়ী বানিয়ে আনতো। ইস্ সেই দিনগুলো কোথায় যে হারিয়ে গেলো।

এ ছাড়াও ছিল ধারওয়ালা, ধার দিবেন, চাকু, ছুরি ধার এই বলে জানান দিতো। এদের কাঁধে থাকতো টুলের মত একটা জিনিস, তাতে চাকা লাগান থাকতো, টুলের তলাতে একটা পেডেল করার জিনিস ও থাকতো। ধারওয়ালা পেডেল করলে চাকাটা ঘুরতো তাতে সব ধার দেওয়া হতো ছুরি, কাঁচি লাগলেই সেখান থেকে আগুনের ফুলকি বের হতো, আর শাঁ শাঁ করে আওয়াজ হতো।

সবচেয়ে সুরেলা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হাঁক দিতে দিতে যেত শাঁখারীরা। ওদের হাতে থাকতো ছোট একটা কাঁচের বাক্স। তাতে সারি সারি নানা রকম ডিজাইনের শাঁখা, পলা থাকত, তারা বাড়ী বাড়ী ঘুরে সধবা গৃহবধূদের হাতে পরম যত্নে সেগুলো পড়িয়ে দিতো।

এরপর দুপুরের দিকে আসতো কাঁশারী, দুপুরের নীরবতা ভেঙে দূর থেকে তার বাটি বাজানোর আওয়াজ শোনা যেতো, ট্যাংটাটাং, ট্যাংটাটাং আর হাঁক দিতো পুরানো বাসন নিয়ে নতুন কাঁশার বাসন দিবো, তার হাত থাকতো একটা ছোট লাঠি, আর একটা বাটি, সে সেটাই বাজিয়ে লোককে তার আসার খবর জানাত।

আমাদের ছেলেবেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিলো আইসক্রীমওয়ালা। আমরা উদগ্রীব হয় অপেক্ষা করতাম তার হাঁকের জন্য। সে আসতো বেলা চারটে নাগাদ। তার হাঁক শুনলেই আমরা বেড়িয়ে আসতাম। আইসক্রীম চাই, আইসক্রীম, শরীর ঠান্ডা করা ম্যাগনলীয়া আইসক্রীম। গরমের সময় খুব বিক্রী হতো। তার কাছে দুধের ছাড়া অরেঞ্জ কালারের জল দিয়ে জমানো একরকম আইসক্রীম থাকতো। সেটা খেলে সারা মুখ ও জীব অরেঞ্জ হয়ে যেতো।

সন্ধ্যা হলে আমরা দূর থেকে আওয়াজ পেতাম টিং, টিং, টিং, টিং ঘন্টার আওয়াজ। এই আওয়াজটা সকলের চেনা হয়ে গিয়ে ছিল। এই আওয়াজ শোনা মাত্র সকলেই বুঝে যেতো বুড়ীর চুল এসে গেছে। লোকটা গলাতে একটা কাঁচের বাক্স ঝোলান থাকতো। আর তার ভিতরে সাদা, সাদা চুলের মত সরু সরু মিষ্টি খেতে এক রকম জিনিস, এরই নাম বুড়ির চুল।

তা ছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যাতে চানাচুরওয়ালা আসতো তার গান।

হরিদাশের বুল বুল ভাজা
খাস্তা তাজা, খেতে মজা
হরিদাশের বুল বুল ভাজা

মাথাতে একটা চোঙা মত টুপি পড়ে যে এই গান গাইতো আর চানাচুর বিক্রী করতো। তা ছাড়া আসত ঝালমুড়িওয়ালা সে ঝালমুড়ি না বলে, ঝা মুড়ি বলে হাঁক দিতো। আমার মনে আছে, এই ফিরিওয়ালাদের কাছে জিনিস কেনার কিন্তু একটা আনন্দ ছিল। সকাল থেকে এই ফিরিওয়ালাদের হাঁকে পাড়া সরগরম হয়ে থাকত। শনি, রবিবার হলে আমরা অপেক্ষায় থাকতাম কখন যে 'জৈন শিল্প মন্দিরের' গাড়ী আসবে, জীবন দাদা, গাড়ী নিয়ে আসতো। তার কাছে থাকত নানা রকমের আচার ডালিমের বড়ি, হজমিগুলী, সবাই খুব কিনতো, যে বেচতো তার নাম ছিলো জীবন, আমরা তাকে জীবনদাদা বলতাম। আগেকার দিনে কয়লার উনুনে রান্না হতো। সেই মাটির উনান ধরানোর জন্যে ঘুঁটে, গুল

এসব ও লাগতো তাই বর্ষার আগে এইগুলোও বিক্রী হতো। দুপুর বেলাতে কাজের মাসীদের গলা পাওয়া যেতো ও বৌদিদি, বড়মা এই ঘুঁটে দিতে এইচে লিব না কী? তারা বলতেন নিয়ে নে। তবে দেখিস কাঁচা যেনো না থাকে। কাঁচা থাকলে বুঝতেই পারছেন গোবরের গন্ধ বেরুবে।

এই যে বিক্রিতারা বাড়ীতে আসতো তাদের কারো কারো সঙ্গে কিন্তু মনেরও একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতো। এমন ও দেখেছি দুপুর বেলাতে কেউ বাড়ী বয়ে কিছু বিক্রি করতে এলে মা, ঠাকুমারা বলতেন ওরে দুটি খেয়ে যা। তারাও আনন্দ করে খেয়ে যেতো।

আমরা যতই আধুনিক যুগে চলে আসি না কেন, পুরনো দিনের জিনিস গুলো কিন্তু ভোলার নয়।

এসো বসো আহারে

কেয়া দত্ত

এসো বসো আহারে এই লেখাটা আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমি কি নিয়ে লিখতে বসেছি।

খাবার সম্বন্ধ্যে কথা উঠলে প্রথমেই বাঙালীদের কথা বলতে হয়, এইরকম খাদ্য রসিক এবং খাবারের সমাজদার লোক খুব কম আছে। তেমনি বাড়ীতে লোক ডেকে আপ্যায়ন করে খাওয়াতেও বাঙালীদের জুরি নেই। কিছু একটা হলেই হোলো, বিয়েবাড়ী, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন, বৌভাত, জামাইষষ্ঠী, মহিলাদের সাধ, এমন কি শ্রাদ্ধবাড়ী যেটা খুব দুঃখের জায়গা সেখানেও নিয়মভঙ্গের দিন প্রচুর লোক নিমন্ত্রিত করে কী কী খাওয়ানো হবে তাই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা। পূজার সময় সে মা দুর্গার পূজাই হোক বা সত্যনারায়ণ পূজা হোক, নিরামিষ রান্না তাতেও কিছু বাদ থাকে না। ধোকার ডালনা, ছানার কালিয়া, পটলের দোলমা, ফুলকপির তরকারী এসব তো আছেই, মিষ্টি খুব কম করেও চার রকম তো থাকবেই। আগেকার দিনে লোকেরা খেতেও পারতেন ভালো। সত্য কিনা জানি না গল্পো শোনা রাজা রামমোহন রায় নাকি একটা আস্ত পাঁঠা খেতে পারতেন। ভাবতে পারছেন কি এরকম কেউ খেতে পারে? আমি তো পারছি না। এরকম বিয়েবাড়ী নিয়েও অনেক গল্প আছে। বিয়ে বাড়ী গেলে আতিথীয়তার কম থাকতো না। বরযাত্রী পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কনের বাড়ীর লোকেরা গলাতে চাদর দিয়ে হাত জোর করে তাদের কিভাবে আপ্যায়ন করবে ভেবে পেতো না। এদিকে বরের বাড়ী লোকেরা মনে মনে অন্য ফন্দি এঁটে আসতো। সব জোয়ান জোয়ান ছেলেরা যেমন বরের ভাই, বন্ধু এরা সব নিজেদের ভিতর ঠিক করে ফেলতো যে খেতে বসে কন্যাপক্ষকে কী ভাবে অপ্রস্তুতে ফেলতে পারবে। ধরুন পাঁচ ছয় জন মিলে ফিসফ্রাই খেতে লাগলো। এক এক জন যদি বারোটা, ষোলটা করে খেতে থাকে তবে ফ্রাই কম পড়বেই। কন্যাপক্ষ যদি বা সেটাকে সামাল দিত, তারপর মিষ্টির উপর অ্যাটাক চলতো। যে কোন মিষ্টি কুড়ি পঁচিটা করে এক এক জন গপ গপিয়ে খেত। তারপর পেটে হাত বুলোতে বুলোতে খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়ত। এমন ভাব যেন খেয়ে তারা কন্যাপক্ষকে উদ্ধার করে দিয়েছে।

বাড়ীতে নতুন বউ যখন আসবে তাকে শুক্তো থেকে মাছের মাথা পর্যন্ত সব সাজিয়ে দেওয়া হয়। খুব কম করেও পনেরো ষোলো

রকম পদ সাজিয়ে দেওয়া হয়। এত খাবার বৌমা কী আর খেতে পারে? যা একটু খেল, বাকীটা সব গঙ্গাতে ফেলে দেওয়া হয় কারণ এটা নাকি আর কেউ খেতে পারবে না।

আমি একটা ছবি দেখেছিলাম "মুর্শিদাবাদ প্যালেস"। এক ভদ্রলোক খাচ্ছেন, থালাভরা খাবার। ছবিটা না দেখলে বিশ্বাস করতাম না যে লোক এরকম খেতে পারে। তার চেহারাও তাই, ছবি থেকে ফেটে বেরিয়ে আসছে। লোকে তাকে বলে একমনী, কারণ তিনি একসঙ্গে বসে রোজ এক মন খাবার খেতেন। আমাদের একটা চলিত কথা আছে – বিড়াল ডিঙোতে পারে না এতো ভাতের পরিমাণ।

আগেকার দিনে অবস্থাপন্ন বনেদি বাড়ীতে রোজকার খাবার হোতো নিরামিষ ছাড়া মাছ, মাংস দুই রকম বা দুই ধরনের মাছ। সব মিলিয়ে সাত আট রকমের পদ হতোই। এটা কিন্তু শোনা কথা নয় আমার নিজের চোখে দেখা। তাও আবার খাওয়া কি রকম মাংস বলো তো কাঁসার জামবাটি ভর্তি করে। কথায় আছে না কবজি ডুবিয়ে খাওয়া, এ হোলো সেই। মাছ হলো তো বড় বড় পিস দুটো করে, বাপরে বাপ বাবুরা খেতেও পারতেন। কী খাওয়ার বহর। আর খেতে না পারলেও আইটেম কম করা যাবে না, কারণ বাড়ীর একটা সন্মান আছে তো। এরপর ধীরে ধীরে সময়ের পরিবর্তনে সব বাড়ীতেই খাওয়া দাওয়া কমতে থাকলো। বড়ো কাঁসার জামবাটি থেকে স্টীলের বাটিতে নেমে আসা হলো। যারা জামবাটি করে মাংস খেতে অভ্যস্ত, তাদের কী আর স্টীলের বাটিতে মন ভরে? বাবুরা খুবই অসন্তুষ্ট হতেন। বলতেন এটা কি মাংস খাওয়া হলো এতো দাঁতের ফাঁকে রয়ে গেল। পেটে আর কিছু গেল না। বুঝুন ছয় সাত টুকরো মাংস খাবার পরও এই কথা বলতেন।

এতো যে খাবারের ঘটা, কিন্তু সব খাবার কী আর সবাই খেতে পারতো? পাতে যা খাবার থাকতো সব ফেলা যেতো। ফেলা যাবে জেনেও কাউকে কম দেওয়া চলবে না। পাতের খাবারগুলোকে বলতো এঁটো খাবার। তবে হ্যাঁ এই এঁটো খাবার একজনরা পেট পুরে আনন্দ করে খেতো। সেটা কারা বলুন তো? বাড়ীর বেড়ালরা।

এখন লোকে আর আগের মত খেতে পারে না। তবু যে কোনো অনুষ্ঠানে খাওয়া দাওয়ার কোনো কমতি নেই। এখনকার দিনে মানুষের পক্ষে এটা মেনটেইন করা খুবই কঠিন। কিন্তু আগে যা বলেছি আমরা বাঙালীরা মন থেকে ভালবেসে লোককে খাওয়াতে চাই। তা যত কঠিনই হোক না।

এটা লিখতে বসে আমার আরো একটা পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ে গেলো। আমি তখন শিলিগুড়ীতে ছিলাম। আমাদের পাড়াতেই একটা মেয়ের বিয়ে হলো। তাদের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। মেয়েটির বাবা অনেকের কাছে সাহায্য নিয়ে বিয়ে দিচ্ছিলেন। আমরা পাড়া-প্রতিবেশীরা সকলেই সেই নিমন্ত্রিণ বাড়িতে গিয়েছিলাম। খাবারের মেনু ছিল মোটা চালের ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা, চচ্চড়ী, মাছের কালিয়া, মাংস, চাটনি, দৈ, মিষ্টি। খাবার শেষে হাতে একটি পান ধরিয়ে ভদ্রলোক বললেন, দাদা সব ঠিকঠাক হয়েছে তো? আমরা বল্লাম এতো আয়োজনের কী দরকার ছিল? উনি বল্লেন, এই তো সুযোগ, আপনাদের আপ্যায়ন করে খাওয়ানোর। এমনি এমনি তো আর ডাকার উপায় নেই।

আপনারা শুনে থাকবেন আগেকার দিনে বড় বড় বাড়ীতে বেড়ালের বিয়ে, পুতুলের বিয়ে, এই সব উৎসব হোতো, তাতেও লোক নিমন্ত্রন করে খাওয়ান হোতো। পুতুলের বিয়েতে তত্ব যেতো, তাতে যার মেয়ে পুতুল তার জন্য শাড়ী, গহনা সবই থাকতো। আরো একটা কথা বলি, যে ভালো ভালো খাবার খাওয়ালেই যে সব সময় মনে তৃপ্তি হয় তা কিন্তু নয়। একবার জলপাইগুড়িতে প্রচুর বন্যা হয়ে ছিলো{ সালটা আমার ঠিক মনে নেই। কোথাও খাবার পাওয়া যাচ্ছিলো না, মাছ তখন কেউ খাচ্ছে না। বাজারে চাল, ডাল, ছাড়া কিছু পাওয়া যাচ্ছিলো না। তখন আমরা বন্ধুরা মিলে ঠিক করলাম আমাদের কাছাকাছি জলপাইগুড়ির বাসিন্দা যারা এসে উঠে ছিলেন, তাদের আমরা খাবার বানিয়ে খাওয়াবো। ঠিক হলো খিচুড়ি হবে, পরে ভাবলাম খালি খিচুড়ি সেটা কী রকম হবে। ভেবে তার সঙ্গে বেগুনভাজা ও তরকারী ও করা হলো। ভেবে দেখুন এই অবস্থাতেও আমরা শুধু খিচুড়ি পাতে তুলে দিতে পারেনি। তবে সেদিন লোককে খাইয়ে মনে যা আনন্দ পেয়েছিলাম তা বলে বোঝানো যাবে না। মানুষের ভিতরই ভগবান থাকেন। সেদিন মনে হয়েছিলো, আমরা ভগবানের সেবা করতে পেরেছি। আরো একটা শোনা কথা। একবার একটা বিয়ে বাড়ীতে সকলে গেছেন বিয়ের লগ্ন অনেক রাত্রে ছিলো। সব নিমন্ত্রিতরা একে একে খেতে চলে গেলো। ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। কিন্তু ডাক আর আসছে না, তখন আমার এক দেত্তর “সিরাজদ্দৌলা” নাটকের রিহার্সাল আরম্ভ করলেন খুব চেঁচিয়ে, চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন দাদুভাই আর যে পারি না খুদায়, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়। তবে বেশীক্ষণ রিহার্সাল চালাতে হলো না, ডাক এলো।

“এসো বসো আহারে।”

ফিরে চলো মাটির টানে

কেয়া দত্ত

বাংলাদেশের কথা অনেক শুনেছি। গ্রাম বাংলার পদ্মানদী, নদীতে মাঝিদের ভাটিয়ালী গান, বাউলদের বাউল গান এই সব শোনার বা দেখার খুব ইচ্ছা ছিল।

২০১১ সালে মে মাসে আমরা পাঁচ দম্পতি মিলে ঠিক করি বাংলাদেশ ঘুরতে যাবার। শেখর, মৃণালদা, পীযুষ, ঋতিংকর ও আমরা। মে মাসে ঠিক করি কিন্তু যাওয়া হলো ডিসেম্বর মাসে।

আমাদের ইচ্ছা ছিল ঢাকা পর্য্যন্ত প্লেনে গিয়ে তারপর একটা ছোট বাস ভাড়া করে গ্রামবাংলার মাটির গন্ধ নাকে নিয়ে মাটির টানে ঘুরে বেড়াব।

আমরা ও সলিলের ছাড়া সকলেরই আদিবাড়ী ওপার বাংলায়। তাই এদের সব স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই বাংলার মাটিতে। তাই মাটির টানের কথা আসছে। সলিলের কাছে শুনেছি ওদের পরিবারের জমিদারী ছিল বাংলাদেশে। দেশ ভাগের পর খাজনা আসা বন্ধ হলেও ঐ জমিদারী থেকে পদ্মমধু আসত। আর সেই পদ্মমধু যারা চোখের অসুখে ভুগতেন তারা দত্তবাড়ী থেকে বিনামূল্যে নিয়ে যেতেন। এই মধু বিনামূল্যে সকলকে বিতরণ করা হতো। পদ্মমধু সহজে এপার বাংলায় পাওয়া যেতো না। শেখরের কাছে জেনেছি ওর জন্ম চট্টগ্রাম হলেও ওদের আদিবাড়ী ব্রাহ্মণবেড়িয়া জেলার শুহিলপুর গ্রামে। আমরা শুনলাম শুহিলপুরে নাকি ন্যাচারাল গ্যাস পাওয়া গেছে, আশা করি এখন নিশ্চয় ওখানের খুব উন্নতি হবে।

তেমনি পিযুষের আদিবাড়ী ঢাকা বিক্রমপুর জেলার কোলা গ্রামে। পিযুষের বাবা কাজের জন্য চলে যান 'বারমাতে' ওর জন্ম বারমাতেই। ঋতিংকর এর বাড়ী আরকান্তি গ্রামের ফরিদপুর জেলাতে। ওর জন্ম বাগুড়াবরাতে। ওদের বাড়ীর নাম ছিল 'অন্নদানিবাস'।

ঋতিংকর কিছুদিন স্কুল করছে ওখানে ও ছাড়া সকলেই দেশ ভাগের আগেই চলে এসেছে ভারতে।

এখানে একটা কথা জানাই, ইরানীদি ও মৃণালদা ওদের কিছু অসুবিধা থাকাতে আমাদের সঙ্গে আসতে পারেনি।

আমরা ৩০শে নভেম্বর ঢাকাতে পৌঁছালাম। ওখানে ঢাকা ক্লাবে সকলের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ক্লাবটা বেশ ভালই। আমরা মেয়েরা ক্লাবে পৌঁছেই কি কি খাবার পাওয়া যেতে পারে তাই নিয়ে মেতে উঠলাম। ওপার বাংলার খাবারের যে সুনাম তা আপনারা সকলেই জানেন। যেমন চিতল মাছের পেটি, বড় গলদাচিংড়ি, পদ্মার ইলিশ, আহা ভাবলেই খেতে ইচ্ছা করে তাই না? মাধবী তো কলকাতা থেকে বলে চলেছে শুটকীমাছ, লইটামাছ কখন খাব। ঢাকা ক্লাবের খাবার এক কথায় অপূর্ব।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা মেয়েরা চলে গেলাম শাড়ীর দোকানে। ঢাকাতে গিয়ে শাড়ী দেখব না তা কখনো হয়। ড্রাইভারকে বললাম শাড়ীর দোকানে নিয়ে যেতে, সে বলে নির্য্যস নিয়ে যাবো। নির্য্যস মানে নিশ্চয়। টি.ভি. তে "কেয়াপাতার নৌকা" একটি সিরিয়াল চলছে, তাই থেকে থেকে দুই, একটা বাঙ্গাল কথা শিখে গেসলাম।

গাড়ী করে ক্লাব থেকে বেরিয়েই প্রচন্ড ট্রাফিক জ্যামে ফেঁসে গেলাম। এরকম ট্রাফিক জ্যাম আমি আগে কখনো দেখিনি।

কলকাতার বাংলা কাগজে যানজট বলে একটা কথা পড়েছিলাম কিন্তু ঢাকাতে যা দেখলাম সেটা তো যানবাহনের গেঁট। এই গেঁটের পরিচয় পরেও আমরা আরো পেয়েছি। সারা দুপুর গাড়ীর ভিতর বসে থাকার পর ড্রাইভার সাহেব আমাদের যে দোকানে নিয়ে গেলেন সেই দোকানে আমরা যেতেই চায়নি। তাকে সে কথা বলাতে তিনি আগের মতন সহাসে বললেন দিদি কোন সমস্যাই নাই আবার চলেন। এদিকে ঘড়িতে প্রায় আটটা বাজবো বাজবো আমাদের সন্ধ্যার আড্ডার সময় হয়ে গেছে, তাই তাকে বলা হোল ক্লাবে ফিরে যাবার কথা। সে কোন সমস্যা নাই বলে আমাদের ক্লাবে ফিরিয়ে এনে সমস্যার সমাধান করলে।

সন্ধ্যার আড্ডাতে যা কথা হোল তা থেকে বুঝতে পারলাম কিছুদিন আগে ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধে যে মারামারি কাটাকাটি এরা দেখেছে তার কাছে কোন সমস্যাই এদের কাছে সমস্যা নয়।

পরের দিন সকালে দেখলাম ঢাকা ক্লাবে ভিন্টেজকারের একটা একজিবিশান হচ্ছে। প্রচুর লোক দেখতে এসেছে, রাত্রে আলো দিয়ে খুব সুন্দর করে ক্লাবটা সাজিয়েছে, গাড়ীগুলো খুব সুন্দর দেখতে সবগুলোর নম্বার প্লেট বাংলাতে লেখা। কুমিল্লা, ঢাকা, চাটগাঁ, ফরিদপুর সব জায়গার

গাড়ী এখানে ছিল। আমি আগে কখনো ভিন্টেজকারের একজিবিশান দেখিনি, তাই আমার খুব ভাল লেগেছে। এই ক্লাবের ভিতরেই একটা শহিদস্মৃতি স্তম্ভ ছিল, আমরা এটা যখন দেখছি তখন এক ভদ্রলোক স্বতস্ফূঃত ভাবে এগিয়ে এসে ভাষা আন্দোলনের সব কথা আমাদের জানালেন। এই ক্লাবের এক স্টাফ এই মুক্তি যুদ্ধে তাঁর জীবন বিসর্জন দেন। ভদ্রলোকের মতে ভাষার জন্য এত তরুণদের প্রাণ বিসর্জন পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

একটা কথা না বলে পারছি না যে এখানকার মানুষরা কিন্তু খুব বন্ধুত্বপূর্ণ এবং অমাইক। ওদের এই ব্যবহারে আমরা সকলেই খুব খুশী ছিলাম। আর দেখলাম বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্রনাথের উপর এদের অগাধ শ্রদ্ধা।

আমরা সেইদিন সকালে ঢাকার প্রসিদ্ধ সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে দেখতে যাওয়া ঠিক করলাম। ড্রাউভারকে বলতে সে কোন সমস্যা নাই বলে আমাদের যেখানে নিয়ে গেল সেটা ঢাকেশ্বরী মন্দির। যাই হোক সেদিন আবার আমাদের বারোদি যাবার কথা। বারোদি ঢাকা থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে, সেখানে লোকনাথবাবার মন্দির আছে। লোকনাথবাবার কথা আপনারা অনেকেই জানেন। গাড়ীতে যেতে যেতে পিযুষের কাছে ওনার অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা শুনলাম।

পিযুষের ঠাকুমা ছিলেন বারোদি গ্রামে নাগবংশের মেয়ে। তিনি যখন খুব ছোটো তখন বাবাকে নিয়ে চোখে দেখে ছিলেন।

সেদিন আমাদের ওখান থেকে ফিরতে বেশ দেরী হয়েছিল। সারাদিন ঘোরার পর সকলেই শরীর খুব ক্লান্ত ছিল। কিন্তু বিশ্রাম নেবার সময় ছিল না।

সেদিন রাত্রে আমাদের ডিনারে নিমন্ত্রিণ ছিল ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রী সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ও তাঁর স্ত্রী রানুর বাড়ী। শেখর ও মন্দিরার সঙ্গে এনাদর আগে থেকে চেনা ছিল। এতজন মাসী, মেসোকে তাঁরা যে ভাবে আপ্যায়ন করলেন সেটা মনে রাখার মত। রানুর কাছে ও শুনলাম তাঁর পরিবারের সঙ্গে লোকনাথবাবা ও বারোদি যোগাযোগের কথা। পরের দিন আমরা রমনার সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী ও আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে গেলাম। তারপর শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ী দেখলাম। ঢাকা ইউনিভারসিটি দেখলাম। তারপর আর আমাদের চোখ খালি কোন শাড়ী দোকানে নাবা হবে ভাবা চলছে। তবে একটা মজার কথা মাধরীর একটা দোকান থেকে

অন্য একটা দোকানে ঘুরতে না ঘুরতেই বার বার খিদে পেয়ে যেত। এই নিয়ে ওর পিছনে আমরা খুব লাগতাম। সোমা সে আবার সব সময়ই কিছু না কিছু ভুলে যেত। আর মন্দিরার ছিল সবকিছুতেই হাসি আর মজা, সত্যকথা বলতে কী আমরা সকলে নিজেদের বয়সটা ভুলে গিয়ে ছিলাম। সারাদিন, হাসি, গান, আড্ডা দিয়েই সময় কাটাতাম।

একদিন ড্রাইভার গাড়ীতে একটা গান শোনালে। মেয়েটির গলা ভারি মিষ্টি, ছবি দেখলাম ভারি সুন্দরী, ব্যাস সলিল চলে গেলো তার C.D কেনার জন্য এরকম সকলকে নিয়েই মজার সব গল্প আছে।

এবার সলিল ও শেখরের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। সন্ধ্যাবেলাতে ওরা ক্লাবে হাঁটছিল। তারপর ওখানে কেকে সপে এক মহিলার সঙ্গে ওদের আলাপ হয়, বয়স চল্লিশের মতো হবে। মুখে কোন প্রসাধন নেই। শাড়ীটা এমন ভাবে পরেছে তাতে পুরো মুখ ডাকা, কথায় কথায় ওরা জানতে পারে মহিলা শুধু উচ্চশিক্ষিতই নয়, খুব বড় চাকরী ও করেন। শুনলাম গান নিয়ে কথা উঠতে তিনি বলেছেন যে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত নয় মেয়েদের যে কোন গান গাওয়া ওদের ধর্ম্মে গুনাহ।

সলিল তখন প্রশ্ন করে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি", এটিও তো সঙ্গীত সেটা করাতেও কি মেয়েদের পক্ষে গুনাহ – মেয়েটি তার কোন উত্তর দেয়নি। বুঝলাম "মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা" সব বাংলাদেশীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তিনদিন ঢাকাতে থাকার পর এবার আমাদের সময় এলো চাটগাঁয়ে যাবার। শুনেছিলাম ঢাকা থেকে চাটগাঁ বাইরোড রাস্তা নাকি ভীষণ সুন্দর কিন্তু সেই সুন্দরের অভিজ্ঞতা আমাদের আর হলো না। কারণ ২০১১র ১৩ই জুলাই বম্বেতে যে ব্লাস্ট হোল তাতে খবর বেরুল যে আতঙ্কবাদীদের কয়েকজন বাংলাদেশেতে পালিয়েছে, তাই বাংলাদেশের আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থা নিয়ে অনেকেই উদ্বেগ জানালেন। তাই ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম প্লেনে যাওয়াই ঠিক হলো।

আমরা ঢাকা থেকে চিটাগাং বা চাটগাঁ এসে পৌঁছালাম। এখানে এসে খুব ভাল লাগল। এখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল চিটাগাঁ ক্লাবের গেস্টহাউসে। থাকার ব্যবস্থা খুবই ভালো। এই ক্লাবেই আমাদের সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজনের আলাপ হল এরা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেন আমাদের সঙ্গে। চাটগাঁ একটি বন্দর শহর। শহরটা যে পুরান সেটা বোঝা যায়। রাস্তা, ঘাট বেশ ফাঁকা। এখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যারা শহিদ হয়েছিলেন তাদের কবর দেখলাম। খুব পুরান চার্চ দেখলাম কিন্তু "চট্টগ্রাম"

অস্ত্রাগার লুন্ঠনের নায়ক সূর্য্যসেনের কোন স্মৃতি বা ফলক কোথাও দেখলাম না। এখানে এক রাত্রি থাকার পর আমরা গাড়ী নিয়ে চলে গেলাম "কক্সবাজার" । সেখানে "সিগাল" বলে একটা হোটেলে উঠলাম, হোটেলটা একবারে সমুদ্রের উপরে। এখানের সি-বিচ খুবই সুন্দর। শুনেছি এখানের সি-বিচ নাকি পৃথিবীর সব থেকে লম্বা। পুরী বা দিঘার মতন ভীড় নেই বেশ ফাঁকা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরা। তবে দেখার মতন বিশেষ কিছু ছিল না। তবে বরমা বাজার বলে একটি বাজার আছে সেখানে প্রচুর জিনিষ পাওয়া যায়। ওখানেই আমরা একদিন থেকে পরের দিন আমরা চাটগাঁতে ফিরি। সেদিন রাত্রে আমাদের ডিনার ছিল ওখানের ডেপুটি হাইকমিশনার শ্রী সোমনাথ ঘোষ ও তার স্ত্রী অনিন্দিতা বাড়ীতে। ওদের বাড়ীতে আরো অনেকের সঙ্গে আলাপ হোল। গল্প করতে করতে কথায় কথায় বিরিয়ানীর কথা উঠলো। এক ভদ্রমহিলা নামটা আমার মনে নেই, তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্য বিরিয়ানীর অর্ডার দিয়ে দিলেন। পরের দিন সকালেই সেই বিরিয়ানী আমাদের কাছে পৌঁছে গেলো। ভাবুন বন্ধুত্ব পূর্ণ না হলে কেউ এরকম করে।

যাই হোক সব মধুর স্মৃতি মনের ভিতর রেখে আমাদের কলকাতা ফেরার সময় হয়ে গেল। কলকাতা এয়ারপোর্টে পৌঁছে মনে হচ্ছিল আর কটা দিন থাকলে হোত।

জানি না আবার কবে আমরা এক সঙ্গে হয়ে এরকম আনন্দ করতে করতে কোথাও যাব কিনা।